রক্ত-মাংস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মডার্ণ কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ঝরা বসু ও
ডঃ প্রদীপ বসুকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

দুই নারী
সোনালি দিন
বন্ধুবান্ধব
প্রকাশ্য দিবালোকে
গভীর গোপন
ব্যক্তিগত
কেন্দ্রবিন্দু
দর্পণে কার মুখ
মেঘ বৃষ্টি আলো
স্বপ্ন লজ্জাহীন
বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার
আকাশ-দস্যু
তাজমহলে এককাপ চা

এক অপরিচিতা

রেল স্টেশানটি ছোট। সন্ধ্যের কাছাকাছি তার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়লো প্রায় খালি একটা ট্রেন। এত ফাঁকা, কোনো কোনো কামরা একেবারে জনশূন্য। বেঞ্চিগুলো নিজেরাই নিজেদের মতন শুয়ে আছে, এমন ট্রেন কি এদেশে সম্ভব? কেন হবে না? বাণপুর লোকালের এর পরের স্টেশানটাই যে বাণপুর।

পাশাপাশি দুটি স্টেশানের নামেরও বেশ মিল আছে। যেন দুই ভাই। বাণপুরের ভাই গণপুর।

এখানেও আট ন' জন মানুষ নামে। নামলো। তাদের মধ্যে আটজন একরকম। প্রত্যেক দিনকার, অবিকল ট্রেনের যাত্রীদের মতন চেহারা, আর একজন অন্য রকম। একটি মেয়ে, সে এইরকম স্টেশান কিংবা এমন পেটরোগা লোকাল ট্রেনে ঠিক খাপ খায় না, এই ধরনের যাত্রিনীদের মানায় দূর পাল্লার লোকাল মেল ট্রেনে। ফার্স্ট ক্লাশ কিংবা এসি কম্পার্টমেন্টের জানলার ধারে বসে থাকে। থেমে থাকা প্লাটফর্মের দিকে তাকায়, কিন্তু কারুর চোখে চোখ ফেলে না।

সুতরাং, এই স্টেশানের হরেক যাত্রীরা মেয়েটির দিকে আড় নয়নে দেখছে। শুধু মেয়েটিকে নয়, তার চেয়েও দামী দুটি সুটকেসকে। তাদের হাতলে লাগানো রয়েছে, এখনো, বিমানের লাগেজ ট্যাগ।

অবিকল সিনেমার নায়িকাদের মতন অসহায়-অসহায় ভাব করে মেয়েটি এদিক-ওদিক তাকায়। দুটি সুটকেস ছাড়াও তার এক কাঁধে ঝুলছে একটি চামড়ার ব্যাগ, অন্য কাঁধে ক্যামেরা। চোখে, চোখের মাপের চেয়েও অনেক বড়, রোদ-চশমা। যদিও পড়ন্ত বিকেলে এখন আলোর সঙ্গে মিশছে অন্ধকার।

যতই এদিক ওদিক তাকাও, এখানে নায়কোচিত চেহারার কোনো যুবক এসে ঐ সুটকেসদুটি তুলে নেবে না। সাইড ক্যারেকটাররাও কেউ বাড়িয়ে দেবে না সাহায্যের হাত। কুলি কুলি বলে চ্যাচালেও লাভ নেই। লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের জন্য কুলিরা হন্যে হয়ে ঘোরে

না। যে-কজন শুঁটকো চেহারার লোক এখানে ব্যাপারীদের মালপত্র বয়, তারা বসে আছে স্টেশানের বাইরে, যার দরকার পড়ে সে গিয়ে ডেকে আনুক।

মেয়েটি নিজেই দু' হাতে তুলে নিল সুটকেস দুটি। দেখা যাচ্ছে সে নিতান্ত অবলা নয়। ও দুটি বেশ ভারী, নিজের ফিগার নষ্ট করে মেয়েটি একটু বেঁকে গেছে। একটুখানি গিয়ে, আবার থেমে, সে তার ফুল ছাপা সিল্কের শাড়ীর আঁচল ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নেয়। নইলে, আঁচল দিয়ে যা ঢেকে রাখার কথা তা ঠিক ঢাকা পড়ছিল না।

গেট অন্য দিকে। ওভারব্রীজ একটা আছে বটে, কিন্তু সবাই লাইন পার হয়ে চলে যায়। মেয়েটি কিন্তু ঐ ভারী সুটকেস দুটি নিয়ে পুরো ওভারব্রীজ ঘুরে এলো। তার ফল হলো এই, যে-তিনটি রিক্সা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, তা আগেভাগে নিয়ে নিল অন্যলোকে। এখান থেকে সা-নগরের বাস-স্ট্যাণ্ড দেড় মাইল, অন্যদিকে পূর্বস্থলী আড়াই মাইল। এই গণপুরে কিন্তু রেলস্টেশানের পাশে কিছু দোকানপাট, সপ্তাহে দু'দিন হাট ছাড়া, সাধারণ লোক-বসতি কিছু নেই বললেই চলে। সবাই বলে, স্টেশান পাবার ন্যায্য অধিকার ছিল পূর্বস্থলীর, কিন্তু এদিক দিয়েই বোধহয় লাইন সোজা পড়ে।

গেটে টিকিট নেবার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সুতরাং কাকেই বা কী জিজ্ঞেস করবে? মেয়েটি ধৈর্য ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং তার ধৈর্যের পুরস্কার হিসেবে একটু বাদেই ফিরে আসে একটি সাইকেল রিক্সা।

তা বলে চালকটাই যে সুটকেস দুটো গাড়িতে তুলে দেবে, এরকম আশা করা যায় না। বাঙালীর ছেলে বাধ্য হয়ে রিক্সা চালাচ্ছে, এতেই সে পৃথিবীকে ধন্য করে দিয়েছে। সে গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খায়।

সুটকেস দুটি এবং তাদের অধিকারিণী যথাসময়ে গাড়িতে ওঠে। কোনোরকম দরদাম হয় না। রিক্সাচালকটি শুধু জিজ্ঞেস করে, পূর্বস্থলী?

—আর একটু দূরে, সেনহাটী।

চায়ের দোকান থেকে দু'জন বাইরে বেরিয়ে আসে রিক্সার এই নবীন যাত্রিনীকে দেখবার জন্য। চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রশ্ন, এ কার ঘরনী, এ কার বালা। সন্ধেবেলা ও একা একা কোথায় যাচ্ছে, সঙ্গে অত দামী সুটকেস?

একটুখানি এগোবার পরই রাস্তার দু'পাশে ধানক্ষেত। আকাশে এখন আলোর চেয়ে কালো বেশী। বর্ষা প্রায় শেষ, তবু গরম কিছুই কমে নি। এখনো পুজোর বাজনা বাজে নি। ধানের বুকে দুধ আসে নি। অবশ্য শিউলি ফুটতে শুরু করেছে।

চোখ থেকে সান গ্লাস এবার খুলে ফেললো মেয়েটি। এরকম সময়ও ঐ চশমা পরে থাকলে লোকে ভাববে চোখের অসুখ। এবং, এই আবছা আলোয়, তার চোখের জলও দেখতে পাবে না কেউ।

প্লাটফর্মের মাটিতে পা দেবার সময় থেকেই মেয়েটি কাঁদছিল, তাই বুঝি সে এতক্ষণ চশমা খোলেনি।

রুমাল বার করে সে চোখ মুছলো। কাঁদলেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিশেষত যে কান্নার কোনো স্পষ্ট কারণ নেই, তা অতি মহার্ঘ। এ-কথা সকলেই জানে, কিন্তু সকলে কাঁদে না।

দ্বিতীয়বার চোখ মুছে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, ডান দিকের ঐ খাল ধারে একটা বড় তেঁতুল গাছ ছিল না?

—ছিল তো, এখন নেই। কেটে ফেলেছে।

—আমায় চিনতে পারো নি, কেষ্টদা?

নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রিক্সাচালকের বদলে সে একজন স্থানীয় মানুষ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে ভালো করে দেখলো এই পাড়াগাঁয়ে সন্ধেবেলা বেমানান যুবতীকে।

—কেন চিনতে পারবো না? আপনি তো ঘোষালবাড়ি যাবেন!

তেঁতুল গাছ

তেঁতুল গাছটার চেহারা বুড়ো ঠাকুর্দার মতন। তেঁতুল পাতা ছোট কিন্তু সংখ্যায় বোধহয় সব গাছের চেয়ে বেশী। তেঁতুল গাছ হবে পাতায় ঢাকা। কিন্তু এ-গাছটাকে যমে ধরেছিল, তা নিয়েও যুঝেছে

বহুদিন। অনেকগুলি ডালই বৃদ্ধের বাহুর মতন, লম্বা, ন্যাড়া, শুকনো। কয়েকটা ডালে পাতা আছে, আলাদা আলাদা ঝোপের মতন।

সবাই বলতো গাছটা রামায়ণ-মহাভারতের আমলের।

পূর্বস্থলীর জুনিয়ার হাইস্কুলে অঘোষিত ছুটি হয়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়োতে দৌড়োতে চলে এলো সেই তেঁতুল গাছতলায়।

সেখানে প্রায় দু'খানা গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়েছে।

গাছটার অনেক উঁচু ডালে ঝুলছে মানুষ। গলায় দড়ির ফাঁস।

সবাই চেনে ওকে, ওতো দশকর্ম ভাণ্ডারের সহকারী দোকানদার পাঁচুদা। কাল বিকেল পর্যন্ত যাকে দেখা গেছে নুন-লঙ্কা-মুসুর ডাল ওজন করে ঠোঙায় মুড়ে দিতে, সে কেন ঝুলছে ওখানে? কেউ তাকে খুন করেছে? কিন্তু ওর মতন একটা অতি সাদা-মাটা গরিবকে কে খুন করবে? যদি বা কারুর শখ হয় খুন করার, তা হলেও অত উঁচুতে নিয়ে গিয়ে ঝোলাবার পরিশ্রম করবে কেন?

পাঁচুর তো কোনো গোপন জীবন ছিল না, দশকর্ম ভাণ্ডারের দাঁড়িপাল্লার সামনে বসা সে ছিল একটা রোগাটে যন্ত্র। কোনোদিন পাঁচুকে কেউ একটা রসিকতা করতে শোনে নি। দোকানের মালিকও তাকে মনে করতেন মোটামুটি বিশ্বাসী। নেহাৎ নিয়মরক্ষার জন্যই মাসে দু'তিনবার গালাগাল করতেন, ক্যাশ না-মেলার সন্দেহের কথা জানিয়ে। সেটা কিছু না।

হঠাৎ মনের দুঃখে নিজেই গলায় ফাঁস লাগিয়েছে পাঁচু? তা হলেই বা সে অত উঁচুতে উঠতে গেল, নিচেও তো অনেক শক্ত, মোটা ডাল ছিল। মৃত্যুর পর সে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছে; সারা জীবনে যে কিছুই বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারে নি, মৃত্যুর পর সে একখানা খেলা দেখিয়ে গেল বটে। মরে তো অনেকেই, পাঁচুর মতন এমন লোক-দেখানো মৃত্যু এ-তল্লাটে আগে ঘটে নি। জীবনে এই একমাত্র উঁচু কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছে সে।

গাছে উঠে কেউ মৃতদেহটি পেড়ে নিয়ে আসবে, সে প্রশ্নই ওঠে না। পূর্বস্থলীতে থানা নেই, থানা সেই সা-নগরে। সেখানে সাইকেলে করে

একজন খবর দিতে গেছে, এখনো কেউ আসে নি।

ওপাশে খাল, গাছের এপাশের ভিড়টা অর্ধ-বৃত্তাকার। নিচে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেখানে গুডিয়ে গুডিয়ে কাঁদছে পাঁচুর বউ।

তারপরই ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের দল। অন্যদের ঠেলে-ঠুলে তারা সামনে এসেছে। এগারো বছরের দাদার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে একটি ন' বছরের মেয়ে। শ্যামল আর দীপ্তি। দু'জনেই এই প্রথম দেখছে মৃত্যু। অদ্ভুত, বিস্ময়কর! পাঁচুদা আর কোনোদিন ঐ দোকানে বসবে না? কথা বলবে না?

ছোট ছেলেমেয়েরা এরই মধ্যে নিজেদের জায়গার দখল রাখবার জন্য ধাক্কাধাক্কি করছে। ওপরের মৃতদেহটির দিকে কয়েকবার তাকিয়েই সেটা পুরোনো হয়ে গেছে, তারা বেশী দেখছে পাঁচুর বউয়ের কান্না। কোনো ভাষা নেই, গলায় জোর নেই, শুধু একটা মোচড়ানো মোচড়ানো শব্দ।

ন' বছরের মেয়েটি তার দাদার পিঠে মুখ ঢাকে।

পাখিদের চোখের পাতা থাকে না বলে সব সময়ই অবাক অবাক দৃষ্টি। দুটো কাক যেন তার চেয়েও বেশী অবাক চোখে পাঁচুর দিকে তাকিয়ে অন্য একটা ডালে বসে ডেকে চলেছে অনবরত।

পাঁচুর খালি গা, পরনে শুধু ধুতি। হাওয়ায় একটু একটু দুলছে শরীরটা, ধুতিটা খসে গেছে অনেকখানি। আর একবার জোর হাওয়া দিলে ধুতিটা একদম খসে পড়ে যেতে পারে।

নিচের লোকেরা প্রায় সবাই কথা বলছে, কিন্তু কে যে কী নিয়ে কথা বলছে তা বোঝার উপায় নেই।

সেই পাঁচুর ভাই কেষ্ট এখন সাইকেল রিক্সা চালায়। দু' জনের মুখের এমন মিল যে মনে হয় যমজ।

হারানো আঙুলি

এগারো বছরের ছেলে, তার ডাক নাম বুড়ো।

মা-বাবারা এই রকম নাম দেয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কামনা,

সন্তান যেন বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত আয়ু পায়।

বুড়ো ঠিক তার বয়েসী উপযুক্ত ছেলেদের মতনই দুরন্ত। কিন্তু চোর অপবাদ তাকে আগে কেউ দেয় নি।

জ্যাঠামশাই বুড়োর কান ধরে টেনে রেখে বললেন, বল্, বাঁদর, কোথায় লুকিয়েছিস আধুলিটা? খেয়ে ফেলেছিস, তাই না? সত্যি করে বল্? কী খেয়েছিস?

বুড়ো প্রথমবার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার সে কোনো উত্তর দেয় না, মুখ গোঁজ করে থাকে।

দু' দিকে ঘর, মাঝখানে বড় উঠোন। সেই উঠোনের একপাশে হোগলার চাটাইতে ধান শুকোচ্ছে। একদিকের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়োর মা। ভাসুরের সামনে তিনি কথা বলতে যাবেন না। তাঁর কষ্ট হচ্ছে খুব। অন্যের বাগানের ফল-পাকুড় না বলে খেতে পারে বুড়ো, কিন্তু সে তো কখনো টাকা-পয়সা চুরি করে না। টাকা-পয়সা চিনতেই শেখেনি এখনো ও ছেলে।

তাও তো মোটে একটা আধুলি।

মায়ের ইচ্ছে করছে ঘর থেকে একটা আধুলি এনে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে।

ভাসুরের এত রাগ কিসের জন্য, তা ভালোই জানেন বুড়োর মা। বুড়োর মা কিন্তু বুড়ী নন, বছর পঁয়তিরিশেক বয়েস, নাম মমতা। তাঁর স্বামী দুর্গাপদ চাকরি করে আগ্রায়। সেখান থেকে প্রতিমাসে স্ত্রীর নামে মানি অর্ডার পাঠায় দুশো টাকার। তার থেকে দেড়শো টাকা দাদার হাতে তুলে দিতে হবে সংসার খরচের জন্য, আর বাকি পঞ্চাশ টাকা মমতার কাছে থাকবে, হঠাৎ যদি কোনো দরকার পড়ে।

কিন্তু দুর্গাপদ টাকাটা সরাসরি তার দাদার নামে পাঠাতে পারতো না? তা হলে গ্রামের লোকের কাছে একটা সম্মান হতো ষষ্ঠীপদর। এখানে ক'জনের নামে মানি অর্ডার আসে?

কিন্তু দুর্গাপদ যদি নিজে সেভাবে টাকা না পাঠাতে চায় তা মমতা কী করবে?

বুড়োর বাবা দুর্গাপদ দাদাকে চিঠি লিখেছে, ছেলে-মেয়েদের কড়া হাতে

শাসন করতে। সেই কড়া হাতে এখন বুড়োর কান টেনে ধরে আছে।

যদিও বাড়িতে একজন কাজের মুনিষ আছে, তবু ষষ্ঠীপদ বুড়োকে পাঠিয়েছিলেন তামাক কিনে আনতে। এ-গ্রামে একটাই মুদি দোকান, মিনিট সাতেক পথ দূরে। দু'টাকার নোটের দেড়টাকার তামাক, আর বাকি পয়সা ফেরে নি।

দু' দিকের দুটো ঘরের দেয়াল পাকা, ওপরে টালি। বাকি পেছন দিকের ঘরগুলি মাটি ও খড়ের চালের। প্রবাসী ভাইয়ের চাকরির টাকায় এই দু'খানি ঘর পাকা হয়েছে। এখানকার জমি-জমার ওপর দু'ভাইয়ের সমান অধিকার।

বড় জা-কে ঢেঁকী-ঘর থেকে বেরুতে দেখে মমতা কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললো, ও দিদি, ও তো বলছে, ওর পকেট ফুটো, আধুলিটা পড়ে গেছে কোথায়। বুড়োর জ্যাঠাইমার বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, মোটা-সোটা ভালো মানুষ। নিজের কাজে অন্যমনস্ক ছিলেন উঠোনের ছোট নাটকটি তিনি ঠিক লক্ষ্য করেননি।

—কী হয়েছে?

সবটা পুরোপুরি না শুনেই তিনি স্বামীর দিকে এগিয়ে গিয়ে স্বামীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, আয় বুড়ো! ওপর থেকে মুড়ি পেড়ে দিতে হবে—

ষষ্ঠীপদ দুর্বলভাবে আস্ফালন করে বললেন, আস্কারা দিও না, তোমরা আস্কারা দিয়েই তো মাথা খাচ্ছো! আমার নিজের ছেলে হলে জুতোপেটা করতুম। এর মধ্যেই পয়সা-কড়ি সরাতে শিখেছে

—চুপ করো! ছেলেটা বলছে যে হারিয়ে ফেলেছে।

—বলছে! কী করেছে জানো। ইচ্ছে করে প্যাণ্টের পকেট ছিঁড়ে এখন বলছে যে পকেট ফুটো।

বুড়ো এখনো হাফ প্যাণ্টের পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে আছে। খালি গা। গলায় ঝুলছে কালো কারে বাঁধা তামার মাদুলি। দু'মাস আগে তার জণ্ডিস হয়েছিল।

জ্যাঠাইমা দুটি বড় চোখ মেলে তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর শান্তভাবে বললেন, বেশ করেছে!

ষষ্ঠীপদ মানুষটি আসলে দুর্বল। রোজ স্নানের সময় পৈতে কাচা তাঁর স্বভাব, তাই পৈতেটি ধপধপে। বুক ভর্তি কাঁচা-পাকা চুল, ঠোঁটে জমিদারি কায়দায় গোঁফ, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে কেউ বশ্যতা মানে না।

জ্যাঠাইমা বুড়োর কাঁধ ধরে নিয়ে গেলেন ভাঁড়ার ঘরে। এ ঘরের চালের নিচে আছে কাঠের পাটাতন, সেখানে থাকে আলু আর চিঁড়ে-মুড়ির বস্তা। মই লাগিয়ে পাড়তে হয়। ছোট ছেলেমেয়ের কাছে ঐ পাটাতনের ভেতরের জায়গাটা মনে হয় বড় রহস্যময়, যেন ওখানে যে-কোনো সময় একটা অজানা কিছুর দেখা পাওয়া যাবে। একবার একটা মোটা সাপ বেরিয়েছিল।

জ্যাঠাইমা বুড়োকে মুড়ি পাড়বার প্রিয় কাজটি দিলেন। কান ছাড়া পাওয়ায় বুড়ো যে এরই মধ্যে খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে তা নয়। তার মুখ থমথমে। এইটুকু বয়েসেই ছেলেটি খুব চাপা স্বভাবের।

বুড়োর ছোটো বোন বুড়ি। সে সার্থক-নামা। টরটর করে বুড়িদের মতন অনর্গল পাকা পাকা কথা বলে, আর পাড়া বেড়ায়। গায়ের রং শ্যামলা, টলটলে দুটি চোখ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লাল রিবন্ দিয়ে বাঁধা। তার ঝ্যালঝেলে হলুদ ফ্রকটা পাট সিল্কের।

দুপুরবেলা পুকুরে আঁচাতে গিয়ে বুড়ি ষড়যন্ত্রের মতন সুরে, চোখটোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আধুলিটা কী করেছিস রে?

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভিজে হাতেই বুড়ো ঠাস্ করে এক চড় কষালো বোনের গালে।

—তোর কী দরকার? বলেছি না হারিয়ে গেছে!

বোনকে পুকুর ধারে ফেলে রেখেই বুড়ো চলে গেল বাড়িতে।

বুড়ি কাঁদলো না। চুপ করে ভাবতে বসলো। পুকুরের জলে ভাসছে তিনটে হাঁস। একটা হাঁসা, দুটো হাঁসী। আকাশের চিল যেমন এমনি এমনি ভেসে বেড়ায় গা ঝেড়ে, তেমনই এই জলের হাঁসেরা। এইমাত্র একটা কিছু ঘটে গেছে বুঝতে পেরে তারা চুপ।

বুড়ির ছোট্ট হৃদয়টি তোলপাড় হচ্ছে। দাদা তাকে মেরেছে, বেশ করেছে। কিন্তু সত্যি কথাটা বললো না কেন? হারিয়ে গেছে, না চুরি

করেছে ? চুরি আর হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে, কিন্তু ঠিক কতখানি তফাৎ ? চুরি করলে রেগে গিয়ে মারতে হয়, না হারিয়ে গেলে ?

বুড়ি সাঁতার জানে না। তবু তার ইচ্ছে করছে একা একা পুকুরে নেমে পড়তে। জল যেন ডাকছে। দুপুরবেলা নিরালায় কারুকে দেখলে জল ডাকে।

জলে এক পা ডুবিয়েছে, এমন সময় বুড়ির ছোটভাইটাকে কোলে নিয়ে মমতা এসে হাজির।

—এই, তুই এখানে একা একা কী করছিস ?

কোনো উত্তর না দিয়ে এক ছুট। বুড়ি এখন কারুর সঙ্গে কথা বলবে না। কথা বললেই কান্না। এমনিতেই তো পাড়ার লোকদের কাছে তার নাম ছিঁচকাঁদুনে বুড়ি।

সাত মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে পার হয়ে এসে বুড়ি মনসাদার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো। এই সময় দোকানে ঝাঁপ ফেলা থাকে।

এই দোকানে বুড়ো তামাক কিনতে এসেছিল। এখান থেকে বাড়ি ফেরার একটাই পথ। পকেটের ফুটো দিয়ে যদি আধুলিটা পড়ে যায়, তা হলে এই রাস্তাতেই তো কোথাও পড়েছে !

হ্যাঁ, বুড়োর প্যাণ্টের ডান দিকের পকেটে ফুটো আছে। প্রথমে ছিল ছোট্ট। কিন্তু ফুটো থাকলেই সেখানে আঙুল চলে যায় বারবার। এখন ফুটোটা ততবড় হতেই পারে, যা দিয়ে আধুলি গলে যায়। একে মোটেই ইচ্ছে করে পকেট ছেঁড়া বলে না।

মাটির দিকে চোখ দুটো গেঁথে বুড়ি আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে। পয়সাটা নিশ্চয়ই এখানেই কোথাও পড়ে আছে। রাস্তার দু'পাশে ঘাস। মাঝখানে সাইকেল যাবার মতন জায়গাটুকু ফর্সা। বুড়ি ঘাসের ওপর পা-ও বুলোচ্ছে, অবশ্য এমন কিছু বড় ঘাস নয় যে একটা আধুলি লুকিয়ে যাবে।

বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেই বুড়ি আবার পেছন ফিরলো, আবার দেখতে হবে। আরও ভালো করে। চুরি না হারিয়ে যাওয়া ? অবশ্য এর

মধ্যে আরও অনেক লোক হেঁটেছে, আর কেউ যদি দেখতে পায়, তাহলে কি কুড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে ? অন্যের পয়সা কেউ এমনি এমনি নিয়ে যায় ? মানুষের যদি আট আনা পয়সা কম থাকে, তা হলে কী হয় ?

বুড়ি আবার মনসাদার দোকানে পৌঁছে গেল। এবারেও চোখে পড়েনি। আবার। তারপর আবার উল্‌টো দিকে। আবার। বুড়ি ছাড়বে না, সে দেখবেই, চুরি, না হারিয়ে যাওয়া ? হারিয়ে যাওয়া, না চুরি ?

সাতবার যাওয়া-আসা করলো বুড়ি, তার চোখ ব্যথা করবার মতন অবস্থা, আধুলিটা নেই।

বিন্ধ্যাচলে

সবচেয়ে সুখের দিন ছিল সেই বিন্ধ্যাচলের এক বছর।

খুব ঝাপসা, অস্পষ্ট ছবি, কিন্তু ফ্রেমটি অপূর্ব সুন্দর। ঐ ফ্রেমের মাঝখানে ছবিটি যেমন ইচ্ছে বদলানো যায়।

বুড়ির বয়েস ছয় কিংবা সাত, মমতা বেশ তরুণী। দুর্গাপদ রেলের বুকিং-ক্লার্ক। বুড়োকে ভর্তি করা হয়েছে এখানকার স্কুলে।

কী ছিল বিন্ধ্যাচলে ? ভালো মনে নেই। একটা মন্দিরে প্রায় সারাক্ষণই ঘণ্টা বাজে, দূরে ছোট ছোট পাহাড়, বাড়ীর কাছেই একটা রাবড়ীর দোকান, চার আনাতেও ছোট খুরিতে রাবড়ি দেয়, অনেক ভিখিরি। বাবা অফিস থেকে ফেরার সময় দু'হাতে বড় দুটো ফুলকপি ঝুলিয়ে নিয়ে আসেন···। সবচেয়ে বড় কথা সুখ ছিল। বড় উজ্জ্বল সুখ।

এক্কা গাড়ি চড়ে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল মীর্জাপুরে। গাড়িটা যেন চলছে তো চলছেই। কপ্ কপ্ কপা কপ্ মধুর শব্দ ঘোড়ার ক্ষুরের। গাড়োয়ানের পাশে বসেছেন বাবা। বীরপুরুষের মতন চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল। ছোট ভাইটার তখন মোটে ছ'মাস বয়েস। সে সারা রাস্তা একবারও কাঁদেনি, জুল জুল করে চেয়েছিল।

কী যেন দেখা হয়েছিল মীর্জাপুরে ? মনে পড়ে না। কিন্তু সুখ ছিল।

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশান মাস্টারও বাঙালী। একদিন বাড়ীতে এসে বুড়ির গাল টিপে আদর করে বলেছিলেন, বাঃ, বেশ মেয়েটিতো

আপনার, ঘোষালবাবু! আমার খুব মেয়ের সখ। একে চুরি করে নিয়ে যাবো নাকি?

—নিন্ না।

—কী নাম তোমার খুকী?

নাম বলতেই বুড়ির এক গা লজ্জা, তখন আবার বুড়ির মুখে আঙুল দেওয়া স্বভাব ছিল। মা মুখ থেকে হাতটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, বল্ বুড়ি। তোর নাম বল্।

—ছিমতী দীপ্তিমই ঘোষাল।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশানমাস্টার অসুখী হয়ে বললেন, এমন সুন্দর মেয়ের নাম রেখেছেন বুড়ী আর দীপ্তিময়ী? এ বড় পুরোনো···ওর নাম রাখুন ঝিল্লি।

তাঁকে খুসী করার জন্য দিনকতক ঝিল্লি ঝিল্লি বলে ডাকা হয়েছিল। তিনি ট্রান্সফার হতেই যে বুড়ি সেই বুড়ি!

আসলে বিন্ধ্যাচলে অবিমিশ্র সুখ ছিল না। পয়সার টানাটানি লেগে থাকতো প্রায়ই। বাবা বলতেন, তিনটে ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিদেশে সংসার টানা, আর পেরে উঠছি না!

স্মৃতিতে বিন্ধ্যাচল বড় সুখের জায়গা, কিন্তু পরে অন্যরকম জানা গেছে। স্মৃতির সঙ্গে পরবর্তী জ্ঞান মিশে গিয়ে বিন্ধ্যাচলের রূপ অনেকটা নষ্ট করে দিয়েছে।

বাবা বীরপুরুষ ছিলেন না, ছিলেন তাসের জুয়ারী। ডিউটির পর রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলতেন আর হারতেন প্রায়ই। তা হোক। তবু বুড়ির মনে হতো তার বাবা পৃথিবীব শ্রেষ্ঠ বাবা, মা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মা। সেই ধারণাও ভেঙে গেল বিন্ধ্যাচলের একেবারে শেষ দিকে।

মাঝ রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে বুড়ি দেখল বাবা মাকে মারছে। নিষ্ঠুরের মতন কয়েকটা চড়, তারপর একটা লাথি।

—হারামজাদী, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে, না? বেশী বেশী শখ্!

মা কাঁদছিল ঠিক বাচ্চা মেয়েদের মতন।

মমতার খুব ইচ্ছে ছেলেমেয়ে নিয়ে স্বামীর সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু

দুর্গাপদ আগ্রায় বদলি হতেই সেখানে আর ওদের নিয়ে গেলেন না,
ছেলেমেয়ে সমেত মমতাকে পাঠিয়ে দিলেন দেশের বাড়িতে।

বুড়োর তখন রেলের টিকিট জমানোর নেশা। প্রায়ই স্টেশানে গিয়ে বাতিল টিকিট নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য কখনো টিকিট কাটতে হয় না। সেবার বাবা সঙ্গে আসেননি। আর একজন সহকর্মী ফিরছিল কলকাতায়, সেই কামরাতে বাবা ওদের তুলে দিয়ে বললেন, ওদের একটু দেখেশুনে বর্ধমানে নামিয়ে দেবেন!

ট্রেন যখন ছেড়ে যায়, তখন বুড়ি দেখেছিল বাবার চোখে জল চিকচিক করছে। বাবা নিজেই ওদের পাঠিয়ে দিলেন, তবু কাঁদছিলেন কেন?

বাবার সেই ভেজা চোখের কথা মনে পড়লেই আবার মনে হয়, সত্যি বিন্ধ্যাচলে সুখ ছিল।

অভ্যর্থনা-১

মনসাদার দোকানটা পার হলেই চোখে পড়ে বাড়ি। একটা বড় একলা তালগাছ দূর থেকে ঐ বাড়ির চিহ্ন।

আর দু'জন ছেলের সঙ্গে রাস্তার ধারে গল্প করছিল বকু, সাইকেল-রিক্সার ক্রিং ক্রিং শুনে অবাক হয়ে তাকালো। এদিকে সাইকেল-রিক্সাও সন্ধের পর ক্বচিৎ আসে।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরে বকুর ভুরু উঁচু হয়ে গেল।

—ও মা, দিদি না? দিদি!

—কেমন আছিস, বকু? বাড়ির সবার খবর ভালো তো?

—কোন্ গাড়িতে এলে? বাণপুর লোকাল? আগে খবর দাওনি কেন, আমরা এস্টেশানে যেতাম!

সাইকেল-রিক্সার পাশে পাশে দৌড়োচ্ছে বকু। দীপ্তি তাকে উঠে বসতে বললো তার পাশে, কিন্তু বকু বসবে না।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বকু আরও জোরে ছুটে গিয়ে গগনভেদী চিৎকার করে বললো, মা, দেখো কে এসেছে! এই দাদা— !

জ্যাঠাইমা, পুনী, দেখবে এসো, কে এসেছে ?

মুহূর্তে ভিড় জমে গেল।

দীপ্তি রিক্সা থেকে নামতেই মা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বুড়ি, তুই সত্যিই এসেছিস ? এতদিনে আমাদের কথা মনে পড়লো ?

জ্যাঠাইমা বললেন, কত বদলে গেছে, ছাখো ! এ যে চেনাই যায় না আমাদের বুড়িকে।

তারপর সবাই মিলে এমন কথা বলতে শুরু করলো যে কিছু শোনাই যায় না। কাছাকাছি বাড়িগুলোর জানলায় কৌতূহলী মুখ। কী হলো ঘোষাল বাড়িতে, এত চ্যাঁচামেচি, কোনো দুর্ঘটনা নাকি ?

দীপ্তি নিজেকে কোনোক্রমে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, দাঁড়াও, মা, রিক্সাভাড়াটা মিটিয়ে দিই।

বকু বললো, কেষ্টদা চলে গেছে। ভাড়া নিল না !

—ওমা, সেকি কথা, ভাড়া নেবে না কেন ? ঠিক আছে, কাল গিয়ে দিয়ে আসিস। দাদা কোথায় ?

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল। মুখে মৃদু মৃদু প্রসন্ন হাসি। সে বললো, এসেছিস তা হলে ? আমি তো ভেবেছিলুম, তুই আর কোনোদিন ফিরবিই না।

জ্যাঠতুতো বোন পুনী বললো, সেজদি, তুমি কী সুন্দর !

অভ্যর্থনা-২

পূর্বস্থলীতে একটা মিষ্টির দোকান খোলা আছে। দীপ্তি রিক্সাকে সেখানে একটু থামতে বললো।

দুটো বড় বড় সুটকেসের জন্য দীপ্তিকে বসতে হয়েছে একটু বেঁকে, বাঁ পাশে পা ঝুলিয়ে, সেই অবস্থায় কসরৎ করে সে নামলো। এ দোকানের মালিক বোধ হয় বদলে গেছে, এখন যে বসে আছে সে দীপ্তির চেনা নয়। সেও দীপ্তিকে চিনলো না। মিষ্টির দোকানের মালিকসুলভ আত্মতৃপ্ত ভঙ্গিতে বসে আছে, এক হাতে একটা তালপাখা।

—কী চাই, বলুন ?

—এই রসগোল্লাগুলো···এছাড়া আর নেই ?

—না।

—সবগুলোই দিয়ে দিন তাহলে।

দীপ্তি কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে বার করলো ছোট পার্স। একটি পাঁচ টাকার নোট, তুটি একটাকার আর কিছু খুচরো পয়সা। বাকি সবই একশো টাকা। রসগোল্লার দাম হয়েছে চোদ্দ টাকা।

—একশো টাকার ভাঙতি তো হবে না!

—হবে না ? তা হলে ? আমার কাছে যে খুচরো চোদ্দ টাকা নেই।

—সারা দিনে বিশ-বাইশ টাকা বিক্কির, বাজার মন্দা, বড় নোটের ভাঙ্তি কী করে দেবো।

—তা হলে···টাকাটা আপনার কাছেই থাক, আমি পরে এসে নিয়ে যাবো।

অচেনা যুবতীর কাছ থেকে এ রকম প্রস্তাব পেয়ে মালিকটি যেন কোনো ফাঁদের আঁচ পায়। নোটটি ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে ভারী শরীরটি উঠিয়ে সে দোকানের পিছন দিকে যায়। সেখানকার দ্বিতীয় ক্যাশবাক্স খোলে।

মিষ্টির হাঁড়িটা হাতে নিয়ে আবার রিক্সায় উঠলো দীপ্তি।

পূর্বস্থলী থেকে সেনহাটী মাত্র মাইল দেড়েক দূর। এ রাস্তা আগে কাঁচা ছিল, এখন শুর্কি পড়েছে। মনসাদার দোকানটাও খোলা আছে, সেখানে বাইরে চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তু'তিনজন লোক। তারা রিক্সার শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, কেউ কোনো মন্তব্য করলো না।

ঐ তো তালগাছটা দেখা যাচ্ছে। ধক্ করে উঠলো দীপ্তির বুকের মধ্যে। বাড়ি, নিজের বাড়ি! এর তুলনায় আর কিছুই কিছু না। চোখ আবার জ্বালা করে।

এ-বাড়িতে কোনো সদর দরজা নেই। বড় উঠোনের তু'পাশে তুই শরিকের ঘর, অন্য তুদিকে গোয়ালঘর, রান্নাঘর। গোয়ালঘরের ছাদটা পড়ে গেছে। উঠোনের মাঝখানে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ নেই। পূর্বস্থলীতে বিদ্যুৎ আছে, সেনহাটীতে অনেকেই তার টেনে আনেনি। ঘোষাল-

বাড়ির দুটি ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে।

বাতাবিলেবু গাছটার নিচে শ্যামলরা একটা বেঞ্চ বানিয়েছিল। চারখানা বাঁশের খুঁটির ওপর তক্তা বসানো। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঐটা আড্ডার জায়গা। দীপ্তি রিক্সা থেকে নেমে প্রথমে মিষ্টির হাঁড়িটা রাখলো ঐ বেঞ্চের ওপরে। তারপর বললো, কেষ্টদা, স্যুটকেস দুটো একটু উঠোনে পৌঁছে দেবে ?

পুকুর ধার থেকে এই সময় এলেন একজন পুরুষ। তাঁর লম্বা শরীরে ধুতির এক খুঁট জড়ানো। আবছা অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না।

—কে ?

—জ্যাঠামশাই, আমি বুড়ি।

ষষ্ঠীপদ কাছে এসে ভালো করে মুখ দেখলেন। তাঁর ভুরু ঈষৎ কুঁচকে গেল। নিরুত্তাপ গলায় বললেন, অ! বুড়ি!

দীপ্তি নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক-থাক, আমার এখনো আহ্নিক হয়নি। যাও, ভেতরে যাও!

তিনি চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

দীপ্তি উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলো, মা! বকু!

কেউ সাড়া দিল না।

কেষ্টদা দু' বারে দুটি স্যুটকেস বয়ে নিয়ে এসে রেখেছে তুলসীমঞ্চের কাছে। সে বললো, আমায় ছেড়ে দিলে হয়।

দীপ্তি পাঁচ টাকার একটা নোট দিল তার হাতে। কেষ্টদা সেটি নিয়ে চাইলো দীপ্তির মুখের দিকে। অর্থাৎ, কত ফেরত দিতে হবে ?

দীপ্তি বলল, ঠিক আছে।

এতে অবশ্য আহ্লাদে ডগোমগো হলো না কেষ্টদা। বরং বিড়বিড় করে বললো, এতখানি রাস্তা উজিয়ে যেতে হবে—

দীপ্তি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগলো, মা, মা!

এই ভর সন্ধেবেলা মমতা ঘুমোচ্ছিলেন!

কয়েকবার ডাক শোনার পর উঠে এসে দরজা খুললেন।

—মা!

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন মমতা। তাঁর পরনের সাদা থানে পুকুরের জলের গন্ধ। চুলে সর্ষের তেলের গন্ধ। তাঁর সত্তায় ঔদাসীন্যের গন্ধ।

কোনোরকম বিস্ময়ের চমক নেই তাঁর চোখে।

—মা, তুমি আমায় চিনতে পারছো না নাকি?

– আয়, ভেতরে আয়!

অন্যদিকের ঘরের বারান্দার দাঁড়িয়ে পুনী আগাগোড়াই দেখছে দীপ্তিকে। একটাও কথা বললো না সে।

পাখির বাসা

একটা বড় বটগাছে কত রকম পাখি বাসা বেঁধে থাকে। এই ইস্পাত কংক্রীটের গাছটি প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু, এর পনেরোটি তলায় একশো কুড়িটি ফ্ল্যাট। নানা জাতের পাখি, প্রায় কেউই কারুকে চেনে না।

লিফ্‌টম্যান অবশ্য সবাইকেই চেনে। এবং তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে। কারুকে দেখলে সে হেসে সেলাম বাজায়, কারুর সামনে গম্ভীর।

নতুন লোক, বাইরের লোকদের দেখলে সে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে। ঝিল্লি রায়কে দেখে সে হাসলো, কিন্তু তার সঙ্গীটিকে সে পছন্দ করলো না। ঝিল্লি রায়ের নিয়মিত সঙ্গীদের সে চেনে, কিন্তু আজকের সঙ্গীটি একজন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা বাঙালীবাবু। ঝিল্লি রায়ের পাশে এমন মানুষ মানায় না।

ঝিল্লি রায় পরে আছে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট, মাথায় চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। তার আঙুলের প্রত্যেকটি নোখই লম্বা এবং এমনই লাল যে মনে হয় রক্তমাখা।

চোদ্দ তলায় লিফ্‌ট থামবার পর লিফ্‌টম্যান বললো, গুড ইভ্‌নিং মেমসাব।

ঝিল্লি রায় হাত ব্যাগ খুলে তাকে দিল একটি এক টাকার মুদ্রা।

ফ্ল্যাটের দরজায় কিন্তু অন্য নাম লেখা। মিস্ অরুণা ইরাণী। ঝিল্লি রায় চাবি বার করে দরজা খুললো। তারপর বললো, আসুন!

টপাটপ সুইচ্ টিপে চার-পাঁচটা আলো একসঙ্গে জ্বাললো ঝিল্লি।

ভেতরে লম্বা প্যাসেজের পাশে পাশে ছোট ছোট ঘর। রান্নাঘর, স্টোর-রুম, বাথরুম, তারপর বসবার ঘর। সেখানেও জ্বললো তিন-চারটে আলো। জানলার পর্দা টেনে খুলে ফেলতেই একটা চমকপ্রদ দৃশ্য ঝলসে উঠলো বাইরে।

ঝিল্লি বললো, এই দেখুন, সমুদ্র!

সন্ধ্যেবেলার সমুদ্র তো দেখবার কিছু নয়। কিন্তু মেরিন ড্রাইভের বিশাল বিশাল আলো ঝলমল বাড়িগুলি যেন একটা মালা হয়ে সমুদ্রের গলায় দুলছে।

—লেখক মশাই, আমার ফ্ল্যাটটা ভালো নয়! আপনাকে জোর করে টেনে নিয়ে এসে কোনো অন্যায় করেছি?

সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন, জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর!

—বসে বসে অনর্গল বক্তৃতা শুনতে আপনার ভালো লাগছিল?

—উত্তর না দিয়ে লেখক হাসলেন।

—আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি।

লেখক এখনো যথেষ্ট বিহ্বল ও বিস্মিত। এই যুবতীটি সম্পর্কে তিনি প্রায় কিছুই জানেন না। বোম্বাইয়ের প্রবাসী বাঙালীরা শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, তাতে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন এই লেখক। যেমন অনেকেই অটোগ্রাফ নেয়, আলাপ করতে আসে, সেই রকম ভাবেই এই মেয়েটি এসেছিল গতকাল। খুব অন্তরঙ্গভাবে হেসে বলেছিল, কেমন আছেন? জানতুম কোনো একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবেই।

লেখকও রহস্যভরে বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই তো আমি এখানে এসেছি। তোমার নাম কি!

—বাঃ, আপনি আমায় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, আর আমার নাম এখন আপনার মনে নেই?

মেয়েটির দিকে ভালো করে তাকিয়েছিলেন তিনি। কাল সে সালোয়ার-কামিজ পরে ছিল। প্রথম নজরে বাঙালী বলে মনেই হয় না। মুখে উগ্র মেক-আপ, তার আড়ালে মুখের আসল সৌন্দর্যটা

ঢাকা পড়ে গেছে। আঙুলের নখগুলি রক্তে ডোবানো। এই রকম কোনো মেয়ে কখনো এই লেখকের কবিতার বিষয়বস্তু হয় নি।

…কোন কবিতাটা বলো তো ?

—"ভ্রূ পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে। সুগন্ধের সঙ্গ পাবো দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়…"

নিজের লেখা সব সময় মনে থাকে না। এই লাইনগুলি অবশ্য লেখক চিনতে পারলেন। অনেকদিন আগে লেখা…কিন্তু এতে কি কোনো মেয়ের নাম ছিল ?

—হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। নাম মনে না থাকলেই বা…

এ রকম আরও কিছু কথা হয়েছিল গতকাল। নিছক হালকা রসিকতা। উদ্যোক্তাদের একজন লেখককে সেই সময় ভেতরে ডেকে নিয়ে যাওয়ায় আলাপ বেশী দূর জমে নি।

আজ সকালে লেখকের নিজস্ব বক্তৃতার পালা চুকে গেছে। বিকেলে সেমিনার, সেখানে তিনি শুধু শ্রোতা। অনবরত শরৎচন্দ্রের নাম শুনতে শুনতে তাঁর ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল, তিনি একবার উঠে এসেছিলেন বাইরে, সিগারেট টানার জন্য।

সেই সময় এই মেয়েটি এসে চুপি চুপি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, চলুন, পালাবেন ?

লেখক তৎক্ষণাৎ বললেন, হ্যাঁ, মন্দ হয় না। কোথায় ?

—চলুন না! আপনি আগে এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকুন, আমি অন্যদিক দিয়ে বড় রাস্তায় যাচ্ছি। আমি অনেকদিন আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলুম, একটা সন্ধ্যে আপনার সঙ্গে বেশ নিরিবিলিতে বসে গল্প করবো।

দেখা যাক না কী হয়, এ রকম একটা মনোভাব নিয়ে লেখক কারুকে কিছু না বলে প্রস্থান করলেন সভাস্থল থেকে। এ রকম প্রস্তাব পাওয়া তো নিছক সাধারণ অভিজ্ঞতা নয়। উগ্র সাজ-পোষাকের এই সুশ্রী মেয়েটি যদি কারুর মাথা চিবিয়ে খেতে চায়, তা হলে সে রকম নরম, কচি, সুন্দর পুরুষের মাথা সে ওখানে অনেক পেতে পারতো। লেখকদের মাথা মোটেই সুখাদ্য নয়, হজম করাও শক্ত।

তিনি ট্যাক্সি থামিয়ে একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই মেয়েটি এসে উপস্থিত হলো! তারপর এই চোদ্দ তলা অ্যাপার্টমেণ্টে।

বসবার ঘরটিতে আসবাবপত্র বেশী নেই। একটি বেশ পুরনো সোফা, কয়েকটি আল্‌গা চেয়ার, একটি সেণ্টার টেবিল। তিন দিকের দেয়ালে তিনটি বড় ছবি। ক্যানভাসের ওপর তেল রং, স্পষ্টতই কোনো একজন শিল্পীরই আঁকা, বড্ড চড়া রং, বিশেষত লালের ব্যবহার চোখে লাগে। কোনো আধুনিক সৌখিন শিল্পীর কাজ।

মিস্ অরুণা ইরাণী! মেয়েটি তাহলে বাঙালী নয়? অথচ এমন সাবলীল বাংলা বলে, বাংলা কবিতা পড়ে? এবার লেখকের মনে হলো মেয়েটির উচ্চারণে যেন সামান্য টান আছে অবাঙালীসুলভ।

লেখক শুনেছিলেন যে বোম্বাইয়ের ফ্ল্যাট বেশ দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। এ রকম একটি বড় ফ্ল্যাটে মেয়েটি একলা থাকে? মেয়েটির বয়স, কত হবে, ছাব্বিশ-সাতাশ? ফিল্‌ম অ্যাকট্রেস নাকি? হিন্দী ফিল্‌মের জগত সম্পর্কে এই লেখকের তেমন ধারণা নেই।

কোনো মেয়ে কোথাও সম্পূর্ণ একলা থাকে, এ রকম দেখলে বা শুনলেই পুরুষদের মনে সাধারণত দুটি-তিনটি পেশার কথাই মনে পড়ে।

লেখক আর গোয়েন্দারা অনেকটা এক জাতের। কোনো নতুন জায়গায় গেলে পরিবেশটা তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নেন মনে মনে। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর, লেখক সোফায় বসে একটি সিগারেট ধরালেন। জানলার বাইরে মেরিন ড্রাইভের আলোর মালার দৃশ্যটি তাঁর দৃষ্টিতে টানলো। আবার। এত উঁচু থেকে কোনো ভারতীয় শহর তিনি আগে দেখেন নি।

এর মধ্যে ফিরে এলো ঝিল্লি। পোষাক বদলে একটা শাড়ি পরে এসেছে। জল দিয়ে ধুয়েছে মুখের প্রসাধন। এখন তাকে নির্ভুল বাঙালী মেয়ে বলে চেনা যায়। লেখক আবার বিস্মিত।

—ওখানে তো দেখলুম, তিন-চার কাপ চা খেলেন, আর নিশ্চয়ই চা খাবেন না?

—নাঃ!

—একটা জিনিস খাবেন? দাঁড়ান আপনাকে দেখাই।

ঝিল্লি আবার বেরিয়ে গেল। বাইরের প্যাসেজটায় ফ্রিজ রাখা। সেটা খুলে, ম্যাজিসিয়ানদের ভঙ্গিতে বার করলো একটা বোতল। সেটির গায়ে ঘামের মতন বরফ জমে আছে।

বসবার ঘরে এসে সেটি লেখকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

লেখক দেখলেন বোতলটি কামপারি'র। হাল্কা ইটালিয়ান আসব। এ জিনিস তিনি আগেও পান করেছেন।

—বেশ তো!

—এটা আমাকে এক বন্ধু এনে দিয়েছে। যেদিন দেয়, সেদিন থেকেই আমি ভেবেছি, কোনো একদিন সন্ধ্যেবেলা আপনাতে আমাতে একসঙ্গে বসে এটা খাবো।

—আমার সঙ্গে···হাঃ হাঃ হাঃ···তুমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলে?

—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? কিন্তু সত্যিই বলছি···

রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে। মেয়েটির এ রকম ব্যবহারের তাৎপর্য কিছুতেই ধরতে পারছেন না লেখক। এ যে বিদেশী গল্পের মতন। বোম্বাই কি ইওরোপ হয়ে গেছে নাকি এর মধ্যে?

—তা হলে আমি যে বোম্বেতে আসবো···তা তুমি ধরেই নিয়েছিলে? অথবা স্বপ্নে দেখেছিলে নাকি?

—স্বপ্ন দেখি নি অবশ্য···দেখতেও পারতুম। এখানকার কাগজে নাম বেরিয়েছিল, কারা কারা শরৎ শতবার্ষিকীতে আসছেন···তাতে আপনার নাম দেখেই···

—আমার দারুণ সৌভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু এবার তো তোমার নামটা জানতেই হয়। তুমি কে?

—আমি? আমি বর্ধমানের একটা খুব সাধারণ একটা গ্রামের অতি সাধারণ একটা মেয়ে। কালকে আপনার সঙ্গে যখন কথা বলেছিলুম, তারপর ওরা কেউ আমার নামে কিছু বলেনি আপনাকে?

—না।

—এখানকার বেশীর ভাগ বাঙালীই আমাকে পছন্দ করে না। ওদের কোনো ফাংশানে আমি গেলে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে

চায় না। অবশ্য অবাঙালীদের সঙ্গেই আমি বেশী মিশি। ওরা অনেক ভালো বন্ধু হয়।

—তোমার নাম তা হলে অরুণা ইরাণী নয়?

—না, না, সে তো আমার বন্ধু···আমরা দু'জনে এই অ্যাপার্টমেণ্টটা শেয়ার করি···একদিন আলাপ করিয়ে দেবো ওর সঙ্গে, খুব ভালো মেয়ে···অবশ্য ও প্রায়ই থাকে না, একটা ফরেন এয়ার লাইন্‌সে এয়ার হসটেস্‌। কই, বোতলটা খুলুন! ওটা ছেলেদের খুলতে হয়।

ঝিল্লি দুটি গেলাস এনে রেখেছে টেবিলে। লেখক বোতলের ছিপি খুলে গেলাস দুটিতে ঢালতে লাগলেন। একই সঙ্গে বিস্ময় ও কৌতুক বোধ হচ্ছে তাঁর। চোদ্দ তলার ওপর একটি নিরালা ঘরে তিনি এক অচেনা যুবতীর সঙ্গে সুরা পান করতে চলেছেন। যদিও লেখকদের সঙ্গে অদেখা পাঠক-পাঠিকাদেরও একটা সম্পর্কের সেতু তৈরি হয়েই থাকে, কিন্তু এই মেয়েটি যেন শুধু পাঠিকা নয়। আরও কিছু। এক বোতল কাম্‌পারি সে জমিয়ে রেখেছে, একদিন এই লেখকের সঙ্গে বসে খাবে!

মেয়েটির চোখে-মুখে রয়েছে প্রাণপ্রাচুর্য। চোখ দুটি উজ্জ্বল ও খানিকটা সারল্য মাখানো। এইসব মেয়ে জীবনের কাছ থেকে যতখানি প্রাপ্য তার সবটাই ভোগ করতে চায়। ভালো, এই তো ভালো, কেন বঞ্চিত হবে? মেয়েরা অনেক শতাব্দী···।

দু'জনে গেলাস দুটি ধরে উঁচু করলো। এই সময় ভারতীয়রা সাধারণত বলে, 'চীয়ার্স'! লেখকও তাই বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মেয়েটি বললো, আ ভত্‌র্‌ সান্তে!

লেখক আবার বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি ফরাসীও জানো দেখছি!

মেয়েটি লাজুকভাবে হেসে বললেন, এই একটু একটু! দু'মাস আগে ফ্রেঞ্চ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, সপ্তাহে দু' দিন। আর দু' দিন রাশিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজ ক্লাসে যাই, তাছাড়া সপ্তাহে তিন দিন সকালেও যাই ইন্টিরিয়ার ডেকরেটিং আর বাটিকের কাজ শিখতে···

—তা হলে তো তুমি খুবই ব্যস্ত বলতে হবে। আজ সন্ধেবেলা কিছু ছিল না?

—ছিল। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে সন্ধ্যেটা কাটাবো, এর তুলনায়

আর সব কিছুই কিছু না! আপনার জন্য আমি ভালো সিগারেটও রেখেছি। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।

—থাক্, থাক। আমি অন্য ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খাই না।

—আমি একটা সিগারেট খেতে পারি? আপনি কিছু মনে করবেন?

—কী আশ্চর্য! মনে করবো কেন? নিশ্চয়ই খেতে পারো।

ভেতরে ভেতরে লেখকের অস্বস্তিটা বেড়েই যাচ্ছে। মেয়েটি অনেক কিছু শেখে বললো। এর প্রত্যেকটার জন্যই টাকা খরচ করতে হয় নিশ্চয়ই। ওর জীবিকা কী? যাকে বলে অস্টেনসীব্‌ল মিন্‌স অব লাইভলিহুড, সেটা না জানতে পারলে মন শান্ত হয় না। দু' একবার এই মেয়েটির যে-পেশার কথা লেখকের মনে এসেছে, সে রকম পেশার মেয়েরা তো ফ্রেঞ্চ-রাশিয়ান শেখে না! বাংলা কবিতাও পড়ে না! কোনো বিরাট ধনীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, একা একা স্বাধীনভাবে থাকে? ধ্যাৎ, এ রকম শুধু হিন্দী সিনেমাতেই সম্ভব।

—আমি কিন্তু এখনো তোমার নাম জানি না।

—আমার নাম···ঝিল্লি রায়···কেমন, পছন্দ?

—বেশ কায়দার নাম, শুনলেই বোঝা যায় বানানো!

ঝিল্লি বেশ উপভোগের সঙ্গে হাসলো। তারপর বললো, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি ঠিক আগে থেকেই জানতুম যে আমার নাম শুনলে আপনি এই রকম কিছু বলবেন। তা হলে আপনি আমার একটা নাম দিন।

—সেটাও তো বানানো হবে।

—তা হোক না। নতুন নতুন নাম পেতে আমার বেশ ভালো লাগে।

—তুমি যে বললে, তুমি বর্ধমানের মেয়ে, কিন্তু তোমার কথায় একটু একটু অবাঙালীদের মতন টান কেন?

—তার কারণ, প্রায় দশ বছর এখানে আছি, অবাঙালীদের সঙ্গেই বেশী মিশি। মারাঠী-হিন্দী-ইংরিজি মিলিয়ে এখানে একটা অদ্ভুত ভাষা চলে, বাংলা তো বলাই হয় না!

হঠাৎ থেমে গিয়ে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝিল্লি আবার বললো, আপনি আমায় বুড়ি বলে ডাকবেন। ওটা আমার ডাক নাম। অনেক দিন কেউ আমায় ঐ নামে ডাকে না!

দুই বন্ধু

দু' জনেই বেশ লম্বা আর রোগা, সদ্য গোঁফ দাড়ি উঠেছে, পা-জামা আর পাঞ্জাবী পরা, তারা হাঁটতে হাঁটতে এসেছিল গণপুর স্টেশান থেকে। তারা পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। শুভরঞ্জন আর নীতীশ।

শুভরঞ্জন বলেছিল, এদিকে কাছাকাছি কোনো এক জায়গায় আমার এক সম্পর্কে মাসির বাড়ি আছে শুনেছি। চল, খুঁজে দেখি। তারপর তারা এসেছিল সেনহাটীর ঘোষাল বাড়িতে।

বর্ষাকাল, চতুর্দিকে জল কাদা, তার মধ্যেই এই শহুরে ছেলেদুটির পাড়া গাঁ দেখার খুব উৎসাহ। তারা পুকুরে দাপাদাপি করে, আমগাছে চড়ে আর সন্ধ্যেবেলা শেয়ালের বাচ্চা ধরবার জন্য ছুটে যায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে। তাদের ভূতের ভয় নেই, কিন্তু সাপের ভয় খুব।

বুড়ি জন্মাবার পর মমতাকে ধরেছিল সুতিকা রোগে। বাঁচবার আশা খুব কম, দুর্গাপদ শেষ চেষ্টা হিসেবে স্ত্রীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কলকাতায়। কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল পিসতুতো শ্যালিকার বাড়িতে। তার স্বামী ডাক্তার। তিনিই শুভরঞ্জনের বাবা। গ্রাম থেকে আসা আধা-আত্মীয় বলে অবজ্ঞা করেন নি, যত্ন করেছিলেন খুব। সে কৃতজ্ঞতা কখনো মুছে যায় নি। পর পর বেশ কয়েক বছর সেনহাটী থেকে নারকোল, আম, ভালো চাল পাঠানো হয়েছে বরানগরের সেই ডাক্তার বাড়িতে।

এতদিন পরেও শুভরঞ্জনকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন মমতা। দারুণ খুশী হয়েছিলেন। কী করে যে এই শহুরে-ছেলেদুটিকে তিনি খাতির যত্ন করবেন, তা ভেবে পান না। দুর্গাপদ তখনও আগ্রায়। ভাসুরের

সঙ্গে মন কষাকষি আরও বেড়েছে। বড় ভাসুরপোটিও হয়েছে এক মূর্তিমান উপদ্রব। নেহাৎ হেঁসেল এখনও আলাদা হয়নি তার কারণ ঐ বড় জা। বড় জা'র নামটি ভারি মজার। মোটা-সোটা গোলগাল ঐ প্রৌঢ়ার নাম তরুলতা। অবশ্য এখন তিনি মা, বা জ্যাঠাইমা বা বড় বৌ, তাঁর নাম ধরে আর কেউ ডাকে না। তরুলতার মতন মানুষ হয় না। একসঙ্গে এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ভালোবাসার জন্যই তিনি যেন জন্মেছেন।

শ্যামলের বয়েস তখন পনেরো, দীপ্তির তের। দুই ভাই-বোনেই খুব ন্যাওটা হয়ে গেল শুভরঞ্জন আর নীতীশের। শুভরঞ্জনের ডাক নাম রাজা, আর নীতীশ তার ডাক নাম বলে নি। দু' জনের মধ্যে নীতীশ বেশী সাহসী, স্বভাবেও একটু গম্ভীর।

বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে ঘুরলে দু' একটা সাপ তো চোখে পড়বেই। যা-তা সাপ নয়, একেবারে আল কেউটে। এ বড় খারাপ জাতের সাপ, বিনা প্ররোচনাতেও তাড়া করে আসে। চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে একজন কারুকে কাটতোই সাপটা, কিন্তু অন্যরা দিশেহারা হয়ে গেলেও শ্যামল মাথা ঠিক রাখে। প্রথমে সেই নিজের গায়ের জামাটি খুলে চট্ করে ছুঁড়ে দেয় সাপটার ওপর। স্বভাব অনুযায়ী সে জামাটার ওপরই ছোবল বসাতে থাকে সাপটা, সেই অবসরে শ্যামল কাছে এগিয়ে যায়। কাছাকাছি লাঠি বা ইটের মতন কোনো অস্ত্র নেই, তবু পায়ের এক পাটি চটি নিয়েই সে অনবরত পেটায় সাপটার মাথায়। অতি বিপজ্জনক কাজ, যে-কোনো মুহূর্তে সে দংশিত হতে পারতো। শেষ পর্যন্ত সাপটাই কাবু হয় শ্যামলের কাছে।

পনেরো বছরের ছেলের এই দুঃসাহসী কাণ্ড দেখে চমৎকৃত হলো রাজা আর নীতীশ। দু' জনেই প্রচুর পিঠ ও কাঁধ চাপড়ালো শ্যামলের। নীতীশ বললো, যার জীবনের ভয় নেই, সেই রকম মানুষ পৃথিবীতে অনেক বড় কাজ করতে পারে।

সেই সূত্রপাত!

সপ্তাহখানেক থেকে, এই দুই কিশোর ও কিশোরীকে মুগ্ধ করে দিয়ে চলে গেল শহরের যুবক দুটি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল, আবার

আসবো!

সাধারণত কেউ আর আসে না। এই এঁদো পাড়া গাঁ একবারের বেশী দু'বার ভালো লাগে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পরের গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার এলো দু' জনেই। এর মধ্যে দীপ্তির এক বছর বয়েস বেড়েছে, শরীরে এসেছে বেশ পরিবর্তন। সে আর আগের মতন রাজা আর নীতীশের কাছে সাবলীল হতে পারে না। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে।

রাজা একবার তাকে কাছাকাছি পেয়ে কাঁধ ধরে টেনে এনে বললো, কী বুড়ি, তুমি কি এই এক বছরের মধ্যে আমাদের ভুলে গেলে নাকি? চলো, আজ ঝিলে মাছ ধরতে যাবো!

দীপ্তি তবু নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। রাজার ছোঁয়াতে তার শরীরে খুব গরম লাগে।

আগেরবার ওরা এসেছিল খালি হাতে। এবার ওরা এনেছে টিনের মাখন, টিনের দুধ, বিস্কুটের প্যাকেট, ভালো চা। রাজা এবারে বেশী উচ্ছল, নীতীশ আর একটু বেশী গম্ভীর।

ঝিলটা বেশ খানিকটা দূরে। গতবার সেখানে যাওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু মাছ ধরা হয়নি। ছিপ ফেলে মাছ ধরার অভ্যেস রাজা বা নীতীশের নেই, এবারই তারা হাতে খড়ি করতে চায়।

শ্যামল বললো, আমি পিপড়ের ডিম জোগাড় করে আনবো, এমন ভালো চারা হবে···

দীপ্তি মাকে জিজ্ঞেস করলো, মা, আমি যাবো ওদের সঙ্গে?

মেয়ে বড় হচ্ছে, এখন মমতাকে মেয়ের ওপর নজর রাখতে হবে। বয়েসের তুলনায় দীপ্তির স্বাস্থ্য একটু বেশী ভালো। হঠাৎ সে তার মায়ের মাথা ছাড়িয়ে গেছে, হাত-পায়ে এসেছে বর্তুল ভাব।

মমতা বললেন, মাছ ধরা তো ছেলেদের কাজ মেয়েদের যেতে নেই। তাছাড়া সারাদিনের ব্যাপার, অতক্ষণ তুই বাইরে থাকলে জ্যাঠাবাবু রাগ করবেন।

মাত্র কিছুদিন থেকেই দীপ্তি শুনতে শুরু করেছে যে মেয়েদের কী কী করতে নেই। তার আগে সে সব সময় তার দাদার সঙ্গে টো-টো

করে ঘুরতো। এখন তার দাদা যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে। কিন্তু সে পারে না।

তিনখানা ছিপ নিয়ে বেরিয়ে গেল দীপ্তিকে বাদ দিয়ে বাকি তিনজন। দীপ্তি সারা দুপুর শুয়ে রইলো।

মেঘলা মেঘলা দিন, রোদের আঁচ নেই। ঝিলের ধারে একটা শিরীষ গাছের তলায় ওরা গুছিয়ে বসলো। শ্যামলই চার-টার ফেলার সব ব্যবস্থা করবে। হাত-ছিপে মাছ ধরায় সে ওস্তাদ। অতুল কাকাদের বাড়ি থেকে সে একটা নাইলন সুতোর হুইল ছিপও চেয়ে এনেছে।

কলকাতার ট্রাম-বাসের আওয়াজ ও ব্যস্ততা থেকে এত দূরে এই অদ্ভুত নীরব-শান্ত জগতে বসে থাকতে থাকতে রাজা একটু বাদেই আপ্লুত বোধ করে।

সে বললো, গ্রামের জীবন এত সুন্দর…সব খাবার টাট্‌কা, মাছ-টাছের স্বাদই আলাদা…ইচ্ছে করে অনেকদিন এখানেই থেকে যাই!

নীতীশ বললো, গ্রামের জীবন সুন্দর? গ্রামে না এলে আমরা গ্রামকে চিনতুমই না। আমরা দু' চারদিনের জন্য এখানে এসে বেশ খাচ্ছি-দাচ্ছি বটে, কিন্তু গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই তো খেতে পায় না। চেহারা দেখিস নি?

রাজা বললো, তবু সবারই কিছু না কিছু ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়ই। কই ভিখিরি তো দেখলুম না। কলকাতায় যত রাজ্যের ভিখিরি—

নীতীশ বললো, গ্রামে যারা একেবারেই খেতে পায় না, তারাই শহরে ভিক্ষে করতে যায়। ওদিকে আবার, গ্রামকে শোষণ করেই শহরের যত কিছু রবরবা।

এইরকম আলোচনা চলে কিছুক্ষণ।

বিকেলের দিকে দুটি উত্তেজক ঘটনা ঘটলো।

হুইল ছিপে আটকা পড়লো কী যেন একটা। মনে হয় জল-দানব। তিনজনে মিলে টানাটানি করেও ছিপ ধরে রাখতে পারে না। শ্যামল তো ছিপ সমেত জলেই পড়ে গেল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সুতো টেনে তোলা হলো বড় একটা কাৎলা মাছ। রাজার ধারণা সেটা অন্তত পাঁচ

তারপর কথা কাটাকাটি, তর্ক, উঁচু গলায় ঝগড়া। সেনবাবু মাছটার আধখানা বখরা চেয়েছিলেন, তাও দেওয়া হবে না।

শেষ পর্যন্ত সেনবাবু অবশ্য জোর করে মাছটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেন না। মাছটার দিকে সতৃষ্ণনয়নে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, খেতে চাও, আরাম করে খাও। কিন্তু ষষ্ঠীদাকে বলে এ মাছের দাম আমি আদায় করবোই, তা তোমরা দেখে নিও।

আসলে সেনবাবুর হিংসে হয়েছে। এই ঝিলে অনেক মাছ আছে ঠিকই, টানা জাল ফেলার সময় বোঝা যায়। কিন্তু সেনবাবু ছিপ ফেললে মাছ ওঠে না। নিজের হাতে মাছ ধরার সুখ তিনি পেলেন না, আর কোথাকার ক'টা আনাড়ি এসে অতবড় একটা মাছ তুললো!

বাড়ি ফিরে শ্যামল আর ঐ সেনবাবুর সঙ্গে ঝগড়ার ব্যাপারটা জানালো না। পরে এই নিয়ে গোলমাল হবে ঠিকই, কিন্তু সে পরের কথা পরে।

অত মাছ, তাই নিয়ে একটা বিরাট ভোজ হলো সেই রাত্রে। শ্যামলের জ্যাঠামশাই খুব তৃপ্তি করে খেলেন, আধখানা মুড়োও দেওয়া হলো তাকে। সেই মুড়ো চিবোতো চিবোতে তিনি বললেন, বড় স্বাদু মাছ, কোথা থেকে ধরলি রে?

শ্যামল বললো, ঐ বড় ডাঙ্গার ঝিলে।

অর্থাৎ জ্যাঠামশাইকে জানিয়ে রাখা হলো, এটা ঝিলের মাছ। তিনি নিজেও খেয়েছেন। সুতরাং পরে আর একলা শ্যামলের দোষ ধরতে পারবেন না।

আরও নানান হৈ-চৈতে কেটে গেল ছ'সাতটা দিন। যাবার সময় শ্যামল আরও দীপ্তিকে রাজা বলে গেল, তোমরাও একবার এসো না কলকাতায়? মাসিমা, ওদের তো একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন! আপনিও সঙ্গে আসুন, আমাদের বাড়ির কাছেই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।

দীপ্তি কোনো কথা বলতে পারেনি সেই সময়। তার খুব ইচ্ছে করছিল ওরা আরও কিছুদিন থাকুক। নীতীশ স্বভাবত চুপচাপ, কিন্তু রাজা হাসি গল্পে সব সময় জমিয়ে রেখেছিল এই ক'টা দিন। কী গমগমে রাজার হাসি। দীপ্তিকে কাছে পেলেই সে হাত ধরে কাছে টেনে

কেজি হবেই, আসলে বড় জোর কেজি দুয়েক।

মাছটা তোলার একটু পরেই যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলো দু'জন মানুষ। শ্যামল চেনে, ওদের একজন সেনবাড়ির মেজবাবু, আর একজন তার মুনীষ। মেজোবাবুরও মাছ ধরার শখ্, ঝিলের অন্য কোনো দিকে বসেছিলেন বোধহয় ঘাপটি মেরে, ওদের চ্যাঁচামেচি শুনে চলে এসেছেন।

সেনহাটী গ্রামে একসময় এই সেনরাই ছিল জমিদার। এখন সেসব বিশেষ কিছুই নেই, তবে অবস্থা একেবারে পড়ে যায়নি। বেনামী বেশ কিছু জমি আছে, তাছাড়া মেজবাবুর দু' খানা বাসের পারমিট।

সেনবাবু কাৎলা মাছটির ওপর দাবি জানালেন। এই ঝিল তিনি বার্ষিক ইজারা নিয়েছেন।

জীবনে এই প্রথম মাছ ধরা, তাও অত বড়। এর উত্তেজনায় রাজার শরীর কাঁপছে এখনো। হঠাৎ একটা লোক এসে চাইলেই কেউ এই মাছ ছেড়ে দেয়?

রাজা আর নীতীশ ফুঁসে উঠলো একেবারে।

আপনি ইজারা নিয়েছেন মানে? মাছ ধরা নিষেধ? সে রকম কোনো নোটিস টাঙ্গানো আছে?

কলেজে-পড়া যুবকদেরও সেনবাবু তুমি বলে সম্বোধন করলেন।

—তোমরা বাইরে থেকে এসেছো মনে হচ্ছে? গ্রাম দেশে আবার নোটিস টাঙ্গানো হয় কবে থেকে?

—কিছু লেখা না থাকলে আমরা বুঝবো কী করে? এত কষ্ট করে আমরা মাছটা ধরেছি।

—এটা কি হেদো না বালিগঞ্জের লেক যে এখানে নোটিস ঝোলাতে হবে? এই তুই ষষ্ঠীদার ভাইপো না? তুই জানিস না যে এই ঝিল আমার?

শ্যামল জানে ঠিকই যে এই ঝিল সেনবাবুদের ইজারা নেওয়া। কিন্তু অনেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যায়। হঠাৎ যে সেনবাবু এসে পড়বেন, তা কে জানতো!

কলকাতার দাদাদের কাছে মান চলে যাচ্ছে দেখে সে বেশ তেজের সঙ্গে বললো, আমি কী করে জানবো, এটা কে ইজারা নিয়েছে!

এনে বলতো, আরে, এই মেয়েটা হঠাৎ এত লাজুক হয়ে গেল কী করে? আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না।

দীপ্তির হৃদয়-সিংহাসনে একজন রাজার অধিষ্ঠান হলো।

দুই শরিক

মমতার ঠোঁটে যে স্তব্ধতা, তা কি অভিমান না ঘৃণা?

এক দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখছেন, কোনো কথাই বলছেন না। প্রথম উচ্ছ্বাসে দীপ্তি নিজেই অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল।

—কী ব্যাপার, তুমি কথা বলছো না যে? আমি এসেছি বলে খুশী হওনি?

—এতদিন আসিস নি কেন?

—আসিনি···মানে···দারুণ কাজের চাপ···তা ছাড়া কত দূর, বুঝতেই তো পারো।

—হঠাৎ তবে আজ এলি কেন?

—এখন ছুটি পেলুম, তাই এলুম।

—এই আট বছরের মধ্যে প্রথম ছুটি পেলি? এর মধ্যে আর ছুটি দেয়নি?

—ছুটি চাইলে পাওয়া যায়, আমি ইচ্ছে করে নিইনি···মা, ওখানে বড্ড খরচ, সবদিক সামলে চলা এত মুস্কিল···

—গত জন্মে অনেক পাপ করেছিলুম, তাই আইবুড়ো মেয়ের রোজগার খেয়ে আমায় বাঁচতে হয়।

—মা, কেন এরকম কথা বলছো? এতদিন পরে আমি এলুম, তুমি আমাকে একটা ভালো কথা বলবে না?

—তোর গায়ে কিসের গন্ধ?

—গন্ধ? এতখানি ট্রেনের রাস্তা·· সারা গা ঘামে চটচটে হয়ে আছে।

—রসুনের গন্ধ!

দীপ্তির ক্ষুণ্ণ মনেও হাসি এসে গেল। অদ্ভুত কথা। সে নানান

রকম দামি পারফিউম ব্যবহার করে, সে সব ছাপিয়ে তার মা শুধু রসুনের গন্ধ পেলেন ? এই ঘোষাল বাড়ির কোনো রান্নায় রসুন ব্যবহার হয় না বটে।

—দাদা আর বকু কোথায় ?

—কী জানি !

—আর বৌদি ? বৌদিও নেই ?

—সে তো প্রায়ই বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকে।

এই সময় থপ্‌থপে আওয়াজ হলো বাইরে। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকলেন জ্যাঠাইমা।

—বুড়ি এসেছে নাকি শুনলাম ? কই রে, বুড়ি কই ?

দীপ্তি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, কেমন আছো, বড়মা ?

—খুব ভালো আছি রে, সোনা ! আয় তো আয়, আমার বুকে একটু আয় !

ছোট শিশুর মতন দীপ্তির মাথাটা বুকে চেপে ধরে জ্যাঠাইমা পাতলা, মিষ্টি সুরে বললেন, তুই কেমন আছিস, মা ! কতদিন পর এলি, একটু যেন রোগা হয়ে গেছিস, মুখটা শুকনো···সে দেশ থেকে কতক্ষণ লাগে রে আসতে ?

জ্যাঠাইমা তাঁর অনেক দিনের পুরোনো আঙুল বুলোচ্ছেন দীপ্তির মুখে। হঠাৎ দীপ্তির কী রকম যেন সন্দেহ হলো। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলো সে জ্যাঠাইমার মুখের দিকে।

—এ কী বড়মা, তোমার কী হয়েছে ?

—আর বলিস কেন, মা, আজকাল আর চোখে দেখতে পাই না !

—চোখে দেখতে পাও না ? কবে থেকে ?

—এই তো দু' সন্, সেই পুজোর পর থেকেই···তা তোর কথা বল্, সে দেশে খাওয়া-দাওয়া কী রকম ? ভালো মাছ পাওয়া যায় ?

মাথায় এক ঝলক রক্ত উঠে আসার মতন দীপ্তির রাগ এসে গেল। চোখে দেখতে পান না মানে কী, জ্যাঠাইমা তো একদম অন্ধ। দুটি চক্ষুই ভাষাহীন। একথা কেউ তাকে চিঠিতে জানাতে পারে নি ?

প্রকৃতির এ কী নিষ্ঠুর খেয়াল! যাঁর চক্ষু দিয়ে সকলের প্রতি ভালোবাসা ঝরে পড়তো, তাঁর দৃষ্টিই আগে কেড়ে নিতে হবে?

—তুমি চিকিৎসা করিয়েছিলে, বড়মা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক ডাক্তার কোব্‌রেজ দেখেছে।

—আমি এসে পড়েছি, আমি তোমায় কলকাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবো।

—শোনো মেয়ের কথা। এখনো সেই পাগলাটিই রয়েছে! একবার অন্ধ হলে কি আর চোখ ভালো হয়? তা আমার তো কোনো অসুবিধে নেই, দিব্যি চলাফেরা করতে পারি। এমনকি দেখতেও পারি। এই যে তোর মুখে হাত বুলোলুম, তাতেই তোকে দেখে নিয়েছি।

মিষ্টির হাঁড়িটা একপাশে নামিয়ে রেখেছিল দীপ্তি। এবার সেটা তুলে নিয়ে জ্যাঠাইমার হাতে দিয়ে বললো, বড়মা, এতে মিষ্টি আছে, তুমি সবাইকে ভাগ করে দাও!

একগাল হেসে ফেললেন জ্যাঠাইমা।

—এত মিষ্টি এনেছিস···আমার ছেলেমেয়েরা কি তোর আনা মিষ্টি খাবে? তোদের ওপর যে ওদের খুব রাগ।

—কেন, বড়মা?

—দুই শরিকের ঝগড়ার কথা তুই জানিস না? কী ঝগড়া, কী ঝগড়া! আমার বড় খোকা আর এ বাড়ির বুড়ো তো প্রায়ই চুলোচুলি করে। আমি পাখার বাড়ি মারতে যাই দুটোকেই··· আমি চোখে দেখতে পাই না তো, তাই সুবিধে হয়েছে, দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে থাকে।

দুই শরিকের মনান্তরের আঁচ অবশ্য দীপ্তি আগে থেকেই পেয়েছে। কিন্তু তা যে এত দূর গড়িয়েছে, তা সে ধারণা করেনি। সেইজন্যই জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করতে যেতে তিনি থাক্ থাক্ বললেন!

অভিমান ভরা কণ্ঠে দীপ্তি বললো, তা বলে, বড়মা, আমি মিষ্টি আনলেও বড়দা খাবে না, পুনি খাবে না?

—আর বলিস কেন বুড়ি। মানুষজন সব যেন কী রকম হয়ে

গেছে ! ছেলেমেয়েরা তো আমার কথা শোনেই না, ঐ বুড়ো মানুষটা, তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, সেও কিনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তোর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ! ভগবান আমায় শুধু অন্ধ করলো কেন, কালা করে দিলে আরও ভালো হতো ।

মমতা এবার বললেন, দিদি, তুমি দাঁড়িয়ে আছো, একটু বসো তো ভালো করে। মেয়েটা সবে এসেছে···এসব কথা তো আস্তে আস্তে জানবেই ! দিদি, তুমি দুটো মিষ্টি খাও !

দীপ্তি বড়মার হাত ধরে বসিয়ে দিল খাটে। মমতা একটা প্লেটে তুলে দিলেন কয়েকটা রসগোল্লা ।

এক গাল হেসে জ্যাঠাইমা বললেন, ওরে, চোখ নেই বলে কি তোরা আমায় অবোধ শিশু করে দিবি ? আর কেউ খেলো না, আমি বুড়োমাগী কি না আগে খাবো ? বকু কোথায় ? বৌমা কোথায় ?

মমতা বললেন, সে তো পশু´ই বাপের বাড়ি গেল ।

যেন এখনো তুই পরিবারের কর্তৃ, এরকম সুরে জ্যাঠাইমা বললেন, অত ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়া কেন ? এ মোটেও ভালো কথা নয় । তাতে স্বোয়ামীর মান থাকে না। এবার থেকে যখন বাপের বাড়ি যাবে, বলবে, যেন আমায় জিজ্ঞেস করে যায় ।

দীপ্তি বললো, ঠিকই তো, বড়মাকে জিজ্ঞেস করে যাওয়া উচিত !

মিষ্টির প্লেটটা পাশে নামিয়ে রেখে জ্যাঠাইমা বললেন, তুই এক কাজ করতে পারবি, বুড়ি ? ও বাড়ি থেকে আমার নাতিটাকে নিয়ে আসতে পারবি ? ওকে একটা মিষ্টি না খাইয়ে কি আমি নিজে খেতে পারি ?

দীপ্তি কিছু বলার আগেই মমতা বললেন, দিদি, এক্ষুনি কি ওর যাওয়া ঠিক হবে ?

—কেন, বুড়িকে কি ওরা মারবে না কাটবে ? ওটা কি শুধু ওদের বাড়ি ? আমার বাড়ি নয় ?

—বড় খোকার বউ তো বুড়িকে চেনেই না ।

—খুব চেনে ! কত শুনেছে ওর কথা। ছবি দেখেছে !

খাট থেকে নেমে পড়ে জ্যাঠাইমা বললেন, তুই চল তো আমার

সঙ্গে। আমরা দু'জনে মিলে যাই। অ্যাদ্দিন বাদে মেয়ে এসেছে বাড়িতে··· দেখি ওরা কেমন শত্তুরের মতন ব্যবহার করে তোর সঙ্গে? আয়!

দীপ্তি তার জ্যাঠাইমার হাত ধরতে গেল, কিন্তু তার দরকার নেই। অন্ধ হলেও জ্যাঠাইমার এ বাড়ির প্রতিটি ইঞ্চি মুখস্থ। সাতচল্লিশ বছর আগে তিনি এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন।

মমতা ওদের বাধা দিতে পারলেন না। যদিও তাঁর মুখের ভাবে আপত্তি।

উঠোনে নেমে জ্যাঠাইমা বুড়ির পিঠে হাত রেখে বললেন, সোনার টুকরো মেয়ে, কতদিন ছেড়ে আছিস আমাদের! আজ তোকে দেখে বড় শান্তি পেলুম!

—বড়মা, তোমার কথা আমার সব সময় মনে পড়ে।

—হ্যাঁরে, বুড়ি, তুই বোম্বাইতে কী চাকরি করিস রে? পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, আমার সবই কানে আসে। আমায় তুই সত্যি কথাটা বলবি তো?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করলো দীপ্তি। তারপরই আন্তরিকভাবে বললো, হ্যাঁ, বলবো, নিশ্চয়ই বলবো। বড়মা, তোমার কাছে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারি?

ভাই-বোন

পার্ট ওয়ান আর হায়ার সেকেণ্ডারির রেজাল্ট বেরুলো সাত দিনের ব্যবধানে। ইস্কুলে রেজাল্ট এসে পৌঁছোতে দেরি হয় বলে শ্যামল তার বোনের রেজাল্ট জানবার জন্য কারুকে কিছু না বলে চলে গেল কলকাতায়। সন্ধেবেলা সে ফিরে এলো লাফাতে লাফাতে। দীপ্তি ফার্স্ট ডিভিশান পেয়েছে।

কেউ আশাই করে নি। পুর্বস্থলীর ইস্কুলের সেরকম সুনাম কিছু নেই। পঞ্চাশটা ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিলে তিরিশ পঁয়তিরিশ জনই ফেল করে। গত তিন বছরে একজনও ফার্স্ট ডিভিশান পায় নি। দীপ্তির সম্পর্কে সেরকম কোনো উচ্চাশার কথাও তো শোনান নি

টিচাররা। নিজের মনে ও কী পড়েছে, তা ও-ই জানে।

এ বছরই বকুর হলো টাইফয়েড। মমতাকে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, সুতরাং সংসারের কাজও করতে হয়েছিল দীপ্তিকে। তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় এমন ফলাফল, খুবই আশ্চর্যের কথা।

আসবার পথেই বর্ধমান থেকে আগ্রায় বাবার কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে শ্যামল। মমতার চোখে আনন্দের অশ্রু। যাক্, এবার তা হলে বুড়ির একটা ভালো বিয়ে হবে। পরীক্ষা দেবার পর থেকেই বুড়ির জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। বর্ধমানের এক ডাক্তারের ছেলে অনেকটা রাজি, শুধু ওরা পাশ করা মেয়ে চেয়েছে।

মমতা বললেন, যা, জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করে আয়!

ষষ্ঠীপদও খুশী মনে বললেন, ছেলেরা তো কেউ পারলে না, মেয়েটাই এ বংশের মুখ-উজ্জ্বল করলো।

ষষ্ঠীপদ'র ছেলে গগন কোনোক্রমে ক্লাস নাইনে ওঠার পর আর স্কুলে যায়নি। শ্যামলও হায়ার সেকেণ্ডারিতে কম্পার্টমেন্টাল পেয়ে পাশ করেছে। আর সেই বাড়ির মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশান।

আগ্রা থেকে দুর্গাপদ চিঠি লিখলেন মেয়েকে আশীর্বাদ জানিয়ে। এবং আলাদা চিঠিতে দাদাকে অনুরোধ করলেন, এবার দীপ্তির বিয়ের জন্য জোর চেষ্টা চালাতে। তিনি টাকা পয়সা জোগাড় করছেন।

রান্নাঘরে জ্যাঠাইমার পাশে বসে এক মনে হলুদ বাটছে দীপ্তি। সেটা শেষ হবার পর শিলের ওপর কতকগুলো শুকনো লঙ্কা নিয়ে জল ছেটাতে লাগলো।

জ্যাঠাইমা বললেন, থাক, তোকে আর লঙ্কা বাটতে হবে না। ওঠ্। হাত জ্বালা করবে!

—না, না, আমি বেটে দিচ্ছি। কিচ্ছু হবে না!

—না বলছি! হাতে কড়া পড়ে যাবে! দু'দিন পর বর এসে যখন হাত টিপবে, তখন নরম নরম হাত না পেলে কি সে খুশী হবে?

—বড়মা, শোনো!

—কী?

দীপ্তি উঠে এসে জ্যাঠাইমার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তিনি অমনি বুঝতে পারলেন মেয়ের কোনো আবদার আছে।

—একটা মাছ ভাজা খাবি?

—না।

স্নেহমাখা চোখ দুটি ফিরিয়ে জ্যাঠাইমা দেখলেন দীপ্তির চোখে জল টলটল করছে।

—কী হয়েছে, কেউ কিছু বলেছে তোকে?

—বড়মা, তুমি আমায় সাহায্য করো, তুমি সাহায্য না করলে আমি মরে যাবো।

—আরে ম'লো জ্বালা! কী হয়েছে খুলে বল্, শুনে দেখি! ভেবেছিস কি। চোখের জল ফেলেই আমার কাছ থেকে যা খুশী তাই আদায় করে নিবি?

—বড়মা, আমি কলেজে পড়তে চাই!

—কলেজে পড়বি? বেশ তো। বিয়ের পর যদি ওরা পড়াতে চায়।

—না। আমি এখুনি পড়বো।

—এখান থেকে তুই কলেজে যাবি কী করে?

—কেন, দাদা তো যায়।

—ও তো ছেলে! রোজ, এতখানি রাস্তা হেঁটে যায় রেল স্টেশানে তুই মেয়েমানুষ হয়ে কি রোজ এত হাঁটতে পারবি?

—কেন পারবো না! খুব পারবো!

—তা ছাড়া খরচাও তো আছে। তোর বাবাকে চিঠি লেখ!

—বাবাকে আগেই চিঠি লিখেছিলুম। বাবার মত নেই। মা বলেছে, বাবার অমতে কিছু করতে পারবে না।

—তোর জ্যাঠাও যে মত দেবে না, তা তো জানাই কথা! তা হলে?

—তুমি ইচ্ছে করলেই পারো, বড়মা!

—হ্যাঁ। আমি সব পারি! মেয়ের কথা শোনো! যেন আমার কথায় সবাই উঠছে বসছে! তোর বিয়ের পর জামাইকে আমি বলে দেবো অখন, লক্ষ্মীসোনা আমার, আমাদের মেয়ের বড্ড কলেজে পড়ার শখ, ওকে তুমি পড়িও।

—আমি এই একটা বছর নষ্ট করবো ?

—তাও তো বটে ! ওদের বাড়িতে কালাশৌচ, ওরা বলেছে, এক বছরের আগে বিয়ে হবে না !

—ভর্তি আরম্ভ হয়ে গেছে। বেশী দেরি হয়ে গেলে আমায় আর নেবে না !

—দেরি হয়ে গেলে নেবে না ! তা হলে তো এক্ষুনি ব্যবস্থা করতে হয় ! কত টাকা লাগে ভর্তি হতে ? আমি বাপু তিরিশ টাকার বেশী দিতে পারবো না !

—তিরিশ টাকায় কী হবে, বড়মা ? অন্তত একশো-দেড়শো টাকা লাগবে !

—খেয়েছে ! ওরে, তোরা কি ভাবিস আমাকে ? আমায় কি কেউ টাকা পয়সা দেয় ? আমি পাবো কোথায় ?

—আমি ষোলো টাকা জমিয়েছি।

—তবে ? বাকি টাকা কি আমি চুরি করবো ?

—টাকার চিন্তা পরে হবে, বড়মা ! তুমি আগে মাকে আর জ্যাঠামশাইকে রাজি করাও !

—রাজি করাতে হবে কি আবার ! আমি বলেছি, তাই যথেষ্ট। আমার মুখের ওপর কেউ কথা বলবে ? দাঁড়া, আমি আসছি।

তক্ষুনি একটা মাটির তৈরি কুমড়ো নিয়ে এলেন জ্যাঠাইমা। এটা তাঁর ঠাকুরঘরে থাকে। অনেককাল ধরে তিনি এটাতে সিকি-আধুলি জমাচ্ছেন। রান্নাঘরের মেঝেতে সেটা আছড়ে ভেঙে ফেলে বললেন, গুনে ছাখ, এতে কত আছে।

ক্রমে জানা গেল, দীপ্তি শুধু ফার্স্ট ডিভিশানই পায়নি, তুটি লেটার এবং পনেরো টাকার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশীপ পেয়েছে। পূর্বস্থলী হাইস্কুলেও রায়বাহাত্বর হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নামে জলপানি আছে, কোনো মেয়ে ফার্স্ট ডিভিশান পেলেই তাকে মাসে কুড়ি টাকা করে দেওয়া হবে। কুড়ি আর পনেরো, পঁয়তিরিশ হলো। কুসুমপুরে নতুন কলেজ খুলেছে, ভালো ছাত্রী বলে দীপ্তিকে তারা হাফ ফ্রি করে নিতে রাজি। সুতরাং দীপ্তির ট্রেন ভাড়াও কুলিয়ে যাবে ওর মধ্যে।

পাক্কা দু'দিন ষষ্ঠীপদর সঙ্গে ঝগড়া করে শেষ পর্যন্ত জ্যাঠাইমাই জিতে গিয়ে মত আদায় করলেন।

যেদিন ভর্তি হতে যাবার কথা, সেদিন জ্যাঠাইমা বললেন, চল, বুড়ি, আমিও তোদের সঙ্গে যাই।

দীপ্তি বললো, তুমি যাবে? কেন? দাদাই তো আমায় ভর্তি করে দিয়ে আসতে পারে।

জ্যাঠাইমা একটু লাজুক আবদারের হাসি হেসে বললেন, যাই না! কোনোদিন আমি কোনো কলেজের ভেতরটা দেখিনি।

– কলেজের ছেলেমেয়েরা যদি তোমায় দেখে হাসে?

—কেন, হাসবে কেন? ওদের কি মা-জ্যেঠিমা নেই বুঝি? তাদের দেখলে ওরা হাসে?

মমতা কৌতুক করে বললেন, দিদি, তুমি বরং এক কাজ করো, তুমিও কলেজে ভর্তি হয়ে যাও!

—হা আমার পোড়া কপাল! আমায় কেউ কোনোদিন ইস্কুলেই পাঠালো না। কত শখ ছিল!

সত্যি সত্যি চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী পরে সেজেগুজে জ্যাঠাইমা গেলেন ওদের সঙ্গে। এবং আগাগোড়া দিব্যি সপ্রতিভ রইলেন।

পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে তিন চার দিন হলো, কিন্তু শ্যামলের নিজের রেজাল্ট জানবার কোনো গরজ নেই। সে বাড়িতে বসে থাকে।

দীপ্তি যা আশঙ্কা করেছিল, তাই হয়েছে। শ্যামল পাশ করতে পারেনি।

গগন সেই খবরটা শুনে এসেছে গণপুর স্টেশানে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে-ই কথাটা চেঁচিয়ে জানালো খুব তৃপ্তির সঙ্গে।

—ও কাইমা, বুড়োটা গাঢ্ডু মেরেছে! ওকে বলো ছোটবোনের পা ধোওয়া জল খেতে।

মমতা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আগের চিঠিতেও তার স্বামী লিখেছেন যে বুড়ো কোনোক্রমে পার্ট টু পাশ করলেই তাকে তিনি রেলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবেন! বুড়ো যে এবার পাশ করতে পারেনি, সেটার

চেয়েও ভয়ের কথা, ও কি আর কোনোদিন পাশ করতে পারবে ? ওর মতি-গতিই যে অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে !

গগনের যেমন লেখাপড়ার মাথাই নেই একেবারে, বুড়োর তা নয়। ছোটবেলা থেকেই সে চুপচাপ স্বভাবের, একরোখা এবং বেশ বুদ্ধিমান। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বুড়োই তো তার ছোট ভাই-বোনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছে। স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে গেলে ছেলেরা হঠাৎ খানিকটা বারমুখো হয়ে যায়। সে সময়ে তাকে একটু রাশ টানবার কেউ ছিল না। বাবার কাছ থেকে স্নেহ বা শাসন প্রায় কিছুই পায়নি বুড়ো। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে অনেকদিন থেকেই তার অপছন্দের সম্পর্ক।

কলেজে ঢুকেই বুড়ো দারুণভাবে রাজনীতিতে মত্ত হয়ে গেছে। এমনকি এই গ্রামের মধ্যেও সে দলবল নিয়ে মিছিল করে গেছে কয়েকদিন।

পশ্চিমবাংলায়, ভারতের নানান প্রান্তে সদ্য যুবকের দল অস্থিরভাবে বিপ্লবের আওয়াজ তুলেছে। গণতান্ত্রিক শাসন কিংবা ভোটাভুটিতে দেশের উন্নতির ব্যাপারে অভক্তি ধরে গেছে তাদের। শুধু মার্কসবাদ নয়, খানিকটা চীনে আফিমও মিশে গেছে তাদের মগজে। শ্রেণীশত্রুকে খতম করবার জন্য তারা এবার সত্যি সত্যি হাত রক্তাক্ত করতে শুরু করেছে। প্রত্যেকদিনের কাগজে এইরকম খুন-জখমের খবর।

এ বাড়িতে কাগজ আসে না। কিন্তু ট্রানজিস্টার রেডিও আছে। রেডিও'র বাঁকাচোরা, অতিরঞ্জিত খবরে এই সব তাজা, আদর্শবান ছেলেদের কাহিনী বেশী ভয়াবহ শোনায়। মমতার বুক কাঁপে। তাঁর ছেলেও কি ঐ দলে জুটেছে ? নইলে সে বন্ধুদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে কেন !

ফেল করার খবরটা শ্যামল শান্তভাবে গ্রহণ করলো। গগনের খোঁচা মারা কথাতেও কোনো উত্তর দিল না সে। যেন পরীক্ষায় পাশ করা না করার মতন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সে মমতাকে বললো, আমায় তাড়াতাড়ি ভাত দাও, আমি একবার বেরুবো।

শ্যামল এমন গম্ভীর যে কেউ কথা বলার সাহস পাচ্ছে না তার সঙ্গে।

দীপ্তি চোখে চোখে রাখছে দাদাকে।

মমতা শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ আবার কোথায় যাবি?

শ্যামলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, কাজ আছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শ্যামলের, রান্নাঘর থেকে খুন্তির মাথায় দুটো পোস্তর বড়া অনেক ব্যালান্স করে নিয়ে এসে জ্যাঠাইমা ওর পাতে দিয়ে বললেন, এ দুটো গরম গরম খেয়ে নে।

পোস্তর বড়া শ্যামলের অতি প্রিয়। তবু সে বললো, আমার পেট ভরে গেছে, আর খাবো না।

জ্যাঠাইমা বললেন, দুটো বড়া খেতে পারবি না? খা! তাতে কি হয়েছে, সামনের বার পাশ করবি। দু'বারে পাশ করলে বেশী শেখা হয়। জ্ঞান বাড়ে!

এই মন খারাপের মধ্যেও মমতার হাসি পেয়ে গেল কথাটা শুনে। তাড়াতাড়ি তিনি অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন।

প্যান্ট-শার্ট পরে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দুপুর রোদ্দুরে বেরিয়ে পড়লো শ্যামল। মনসাদার দোকান পেরিয়ে মাঠের রাস্তায় পড়বার পর সে একটা সিগারেট ধরালো।

ঠিক তখনই সেনবাবুদের বাগানের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো দীপ্তি।

নতুন অভ্যেস তো, তাই ছোটবোনকে দেখেও সিগারেটটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল শ্যামল। তারপর সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী ব্যাপার?

—দাদা, তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—যাচ্ছি একটা কাজে।

—কোথায়!

—তাতে তোর দরকার কী!

—না, আমায় বলতে হবে।

—কেন, বলতে হবে কেন? যা, বাড়ি যা!

—না, আমি যাবো না। আমি তা হলে তোর সঙ্গে যাবো!

—কেন জ্বালাতন করছিস, বুড়ি! বলছি না, আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি!

কী জানি কী ভেবেছে দীপ্তি, কিছুতেই সে শ্যামলকে একা ছাড়তে চায় না আজ। ছিনে জোঁকের মতন সে দাদার সঙ্গে লেগে রইলো। শ্যামল এক একবার দাঁড়িয়ে পড়ে বকুনি দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যায়, দীপ্তি আবার এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে।

স্টেশানে এসে শ্যামল উঠে পড়লো কলকাতার দিকে লোকালে, দীপ্তিও উঠে পড়লো। শ্যামল মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো অন্য দিকে, যেন সে তার বোনকে চেনেই না। দু'তিন স্টেশান পরে যখন বেশ ভিড় হয়ে গেল, তখন সেই কামরার আর তিনটি ছেলে বেশী করে চিনতে চাইলো দীপ্তিকে। ইদানীং এরকম শুরু হয়েছে। অন্য জায়গা থেকে উঠে এসে দীপ্তি জোর করে বসে পড়লো শ্যামলের পাশে।

দু' জনেই নামলো দক্ষিণেশ্বরে। কেউই টিকিট কাটেনি, অবশ্য দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে টিকিট চাইবারও কেউ নেই।

শ্যামল কড়া গলায় বললো, কেন পাগলামি করছিস, বুড়ি? এক্ষুনি উল্টোদিকের ট্রেন আসবে, বাড়ি ফিরে যা।

দীপ্তিও জেদের সঙ্গে বললো, না, আমি যাবো না! ফিরতে হলে একসঙ্গে ফিরবো।

অনেক চেষ্টা করেও শ্যামল নিরস্ত করতে পারলো না বোনকে।

স্টেশান থেকে নিচে নেমে মন্দির বা গঙ্গার ধারে গেল না শ্যামল। বেশ কিছুক্ষণ কয়েকটা গলি ধরে হেঁটে, তারপর দাঁড়ালো একটা বাড়ির সামনে। দরজায় তিনবার ঠক্ ঠক্ করতেই খুলে গেল দরজা।

পাঁচ ছ'টি ছেলে সেখানে কোনো বিষয়ে ঘোর আলোচনায় মত্ত ছিল, ওদের দেখে হঠাৎ থেমে গেল।

এক পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে নীতীশ। এটা তারই বাড়ি। শ্যামলের ভঙ্গি দেখে মনে হলো, এখানে সে আগেও কয়েকবার এসেছে।

শ্যামল বললো, নীতীশদা, আমি মন ঠিক করে এসেছি। আপনি যা বলেছিলেন, আমি সেই অ্যাকসানে নামতে রাজি আছি।

নীতীশদা আর অন্য সব কটি ছেলেরই মুখে চোখে তীব্রতা মাখা। হাসির চিহ্নমাত্র নেই। কেউই দীপ্তির দিকে মনোযোগ দিল না,

নীতীশও যেন দীপ্তিকে চিনতেই পারে নি। ওরা যে ব্রত নিয়েছে, তাতে এখন মেয়েদের কোনো আলাদা মূল্য নেই।

শ্যামলদের কলেজে একদিন বক্তৃতা দিতে গিয়েছিল নীতীশ, সেই থেকে শ্যামলের সঙ্গে তার নতুনভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে সবাইকে লিন পি আও তত্ত্ব বোঝাতে লাগলো নীতীশ। দীপ্তি তার প্রায় কিছুই বুঝলো না। হঠাৎ এক সময় কথা থামিয়ে নীতীশ বললো, শ্যামল, তোমার বোনকে বরং তুমি রাজাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। রাজার বোন খুকুর সঙ্গে ও ভাব করতে পারবে। বেচারি এখানে বসে বসে শুধু বোর্ হচ্ছে। ঐ তো ঐ কোণে রাজাদের বাড়ি।

দীপ্তি বললো, না, আমি এখানেই থাকবো। আমি শুনছি, আপনাদের কথা, বুঝবার চেষ্টা করছি।

—তা হলে বসো।

একটু পরে অবশ্য রাজা নিজেই এসে হাজির হলো সেখানে।

দুই বন্ধুর পথ এখন দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। অবশ্য দু'জনের বন্ধুত্ব এখনো আছে। রাজা মাঝে মাঝে এখানে এসে ওদের ঠাট্টা করে।

রাজা তো এদের মতন মরণ-ব্রত নেয়নি, তাই প্রথমেই মেয়েদের দিকে তার চোখ পড়ে।

—আরেঃ, এ কে ? বুড়ি না ? তুমিও এদের দলে যোগ দিয়েছো নাকি ?

রাজাকে দেখা মাত্র দীপ্তির বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। এই মানুষটা তো আর জানে না যে গত তিন চার বছর ধরে দীপ্তি মনে মনে ওরই ধ্যান করছে।

বাবা

বছরে একবার দেশের বাড়িতে আসে দুর্গাপদ। সঙ্গে দুই সুটকেস ভর্তি জামা কাপড়, বাড়ির সকলের জন্য। তখন মমতার মুখ চোখের জ্যোতিই অন্যরকম হয়ে যায়। মমতার স্বভাবটাই পল্লবিনী লতার মতন কারুকে অবলম্বন না করে তিনি সোজা থাকতে পারেন না।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এই গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না তাঁর।

প্রত্যেকবারই দুর্গাপদ এসে বলেন, এবার তোমাদের নিয়ে যাবো আগ্রায়, একটা ভালো কোয়ার্টার শিগগিরই পাচ্ছি, একজন ট্রান্সফার হয়ে গেলেই। কিন্তু কোনো রহস্যময় কারণে সেই ব্যক্তি কিছুতেই ট্রান্সফার হয় না কিংবা ভালো কোয়ার্টার আর তাঁর জোটে না।।

যাই হোক, অন্যবার তবু আশ্বাস বাক্য থাকে, এবার তাও নেই। এবার তার মূর্তিই অন্যরকম।

দুর্গাপদ মানুষটি হাসিখুশী ধরনের। বাড়িতে এলে কটা দিন জমিয়ে রাখেন। ঘুরে ঘুরে পাড়াপ্রতিবেশীর খবর নেন। বাড়ি মেরামতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, নিজের হাতে গোয়াল ঘরের বেড়া বেঁধে দেন। এবার সে সব কিছুই নেই।

প্রথম দিন তিনি এসে পৌঁছলেন দুপুরে। তখন শ্যামল বা দীপ্তি কেউ বাড়ি নেই, দু'জনেই কলেজে গেছে। দীপ্তি অবশ্য ফিরলো সন্ধ্যের আগেই, শ্যামল ফিরলো রাত ন'টার পর। তারপর লেগে গেল পিতা পুত্রে।

নিজের পায়ের চটি খুলে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলেকে মারলেন দুর্গাপদ।

—এত বাড় বেড়েছে তোর? লেখাপড়ার নাম নেই, শুধু বাড়ির অন্ন ধ্বংস করছিস আর আমার কষ্টের টাকা নষ্ট করছিস। রাত ন'টার আগে বাড়ি ফেরা নেই ছেলের? দাদার কাছ থেকে আমি সব শুনেছি। এমন দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। কাল থেকে মাঠে গিয়ে হাল চাষ করবি।

শ্যামল টু শব্দটিও করেনি, কিন্তু মমতা মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতে এলে স্বামীর কাছ থেকে একটা জোরে ধাক্কা খেলেন।

তারপর এলেন জ্যাঠাইমা।

দুর্গাপদ তাঁকেও ধমক দিয়ে বললেন, তুমি সরে যাও, বৌদি। তুমিই তো আস্কারা দিয়ে ছেলেটার মাথা খাচ্ছো! তোমার নিজের ছেলেটারও কিছু হলো না···।

জ্যাঠাইমা বললেন, খুব যে নিজের আর পরের বুঝতে শিখেছো! সারা বছর কোনো খোঁজ রাখো না! যাও, এখন সরো!

—বৌদি, তুমি বুঝতে পারছো না, এ ছেলে আমায় কতটা দাগা দিয়েছে। ভেবেছিলাম ও পাস করলে ওকে একটা চাকরিতে ঢোকাতে পারবো, আমার চাপ অনেকখানি কমে যাবে। যদি হঠাৎ একদিন চোখ বুজি···

—ওসব অলুক্ষণে কথা বলতে হবে না! তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? অত জোরে জোরে কথা কইছো কেন, আমি কি কালা?

সে রাত্রির আহার সকলের মুখেই বিস্বাদ লাগলো।

মাঝ রাত্রে খুট করে একটা শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল দীপ্তির।

—কোথায় যাচ্ছিস রে দাদা?

—জাহান্নামে।

সেবারও কোথাও যাওয়া হলো না শ্যামলের। দীপ্তি ফিরিয়ে আনলো তাকে। কিংবা হয়তো সে কোথাও যাচ্ছিল না, এমনই রাতের খোলা হাওয়া লাগিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল, দীপ্তি তাকে সে সুযোগও দেবে না।

সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শ্যামলের হাত চেপে ধরে দীপ্তি বললো, দাদা, তুই প্রতিজ্ঞা কর, বাবার মুখে মুখে কথা বলবি না। বাবা বকলেও কিছু উত্তর দিবি না! বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাবি না। আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, নইলে আমি তোকে ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না।

দুর্গাপদ দাদার খুব ভক্ত। দাদার ওপর অগাধ বিশ্বাস। সেই দুর্গাপদই কয়েকদিনের মধ্যেই দাদার কাছে বিষয়-সম্পত্তির হিসেব চাইলেন।

পারিবারিক সম্পত্তিতে দুই ভাইয়ের সমান অধিকার। প্রায় তিরিশ বিঘের মতন ধান জমি, দুটো পুকুর। কিন্তু এতদিন ষষ্ঠীপদই সব দেখাশুনো করেছেন, দুর্গাপদ কোনোদিন কিছু ভাগ চায়নি তো বটেই, উপরন্তু টাকা পাঠিয়েছে প্রতিমাসে। টিউবওয়েল বসানো, পুকুরের ঘাট বাঁধানো, সবই দুর্গাপদর খরচে।

মমতা স্বামীর কথা কিছুতেই বুঝতেই পারছে না। এ যেন অন্য

মানুষ। দুর্গাপদ যখন কথা বলেন, তখন তাঁর মুখের মধ্যে কী যেন ঝিলিক দেয়।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো? ভাসুর ঠাকুরের সঙ্গেও তুমি ঝগড়া করছো?

—নিজের ভাগটা বুঝে নিতে হবে না? দাদা সর্বস্ব গ্রাস করবে? আমি চোখ বুজলে তোমাদের কী হবে?

—কেন ঐ কথা বলছো?

—বলছি কি এমনি এমনি! সবাই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে। পাঁচ জন ডাক্তার দেখেছে আমাকে। এলাহাবাদে আমাদের হাসপাতালে ছিলাম দু'হপ্তা। ওরা বলে দিয়েছে, আমার আয়ু আর মাত্র তিন মাস।

—অ্যাঁ!

—দেখবে! এই ছাখো, ভালো করে ছাখো!

মুখটা বড় হাঁ করে স্ত্রীর একেবারে মুখের সামনে নিয়ে এলেন দুর্গাপদ। বিকৃত স্বরে বললেন, দেখছো? দেখতে পাচ্ছো?

মমতার শরীর হিম হয়ে গেল।

দুর্গাপদর জিভটা একেবারে নীল। মানুষের যে এরকম জিভ হতে পারে কল্পনাও করা যায় না। অনেক কালো জাম খেলে জিভের রং এরকম বদলে যায় বটে, কিন্তু এখন কালো জাম কোথায়?

—এ কী হয়েছে? কী লেগেছিল জিভে?

—শয়তানের থুথু! শয়তান আমার মুখে থুথু ফেলেছে, ছোট বউ! জীবনে আমি অনেক পাপ করেছি তো!

মমতার আর্তনাদ শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো দীপ্তি।

—কী হয়েছে, মা? ওরকম করছো কেন?

মাটিতে পা ছড়িয়ে অদ্ভুতভাবে বসে আছেন মমতা। চোখ দেখলে মনে হয় সংজ্ঞা নেই।

স্ত্রীকে সুস্থ করার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না দুর্গাপদ। দীপ্তির কাঁধ ধরে বললেন, মাকে পরে দেখবি। আগে আমার দিকে ছাক বুড়ি। এই যে ভালো করে ছাখ।

বিকট হাঁ করে মেয়েকেও সেই নীল রঙা জিভ দেখালেন দুর্গাপদ।

আগে সাহেবদের কোম্পানি ছিল, এখন মাড়োয়ারির। আগে যে হলঘরে মোট ষোলোজন বসতো, এখন সেখানেই ছোট ছোট টেবিলে বসে ছত্রিশজন। বারো জন টাইপ করে, বাকিরা খাতা লেখে।

টাইপিস্ট সব ক'জনই মেয়ে। কে মারাঠী, কে গোয়ানিজ, কে সিন্ধি বোঝবার উপায় নেই সহজে। সকলেরই ছোট ছোট চুল, ঠোঁটে লিপস্টিক। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে কথা।

কোম্পানিটা এতই বড় এবং এতগুলি শাখা প্রশাখা যে অনেক কর্মচারি মূল মালিককে চোখে দেখেনি। তবে মালিকের পরিবারটিও বৃহৎ, আত্মীয় পরিজনদেরই কেউ না কেউ এক একটা ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার।

মালিকের শালা চিমনলাল এই অফিসটি চালায়। শুধু গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায় না, নিজেও বেশ খাটে, প্রত্যেকদিন ঠিক সময়ে অফিসে আসে।

একটা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত লাঞ্চ আওয়ার। তখন অফিস একদম ফাঁকা হয়ে যায়। এমনকি বেয়ারারাও থাকে না।

শুধু একজন যায়নি। সে টাইপ রাইটার যন্ত্রটির ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সাঁইবাবার আংটিটা অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের ওপর খুলে রেখেছিল চিমনলাল। ওটা সঙ্গে না নিয়ে সে কোথাও যায় না, তাই গাড়িতে অনেকখানি চলে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে আংটিটা নিতে।

হলঘরটার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে চিমনলাল প্রথমে কান্নার শব্দ শুনলো, তারপর দেখলো টাইপ রাইটারের ওপরের ক্রন্দনরতাকে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তার নিজের দুঃখের মধ্যে এমনই নিমগ্ন যে আর অন্য কিছুর খেয়ালই নেই তার।

—হোয়াট হ্যাপন্‌ড্‌, মিস রায়?

ঝিল্লি দারুণ চমকে মাথা তুললো। সারা মুখ তার জলে ভেজা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে বললো, আই অ্যাম ভেরি সরি, স্যার,

আই থট নো ওয়ান ওয়াজ হিয়ার।

—আমি জানতে চাইছি, তোমার কী হয়েছে ?

—আমার বাড়ি থেকে একটা খারাপ খবর এসেছে···আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না···

—এনি মিসহ্যাপ্ ইন দা ফ্যামিলি ?

—আমার দাদা···আমার দাদা, ইয়ে···মানে, গুরুতর অসুস্থ, সেই টেলিগ্রাম এসেছে।

—দেখি টেলিগ্রামটা।

সেটা পড়লো চিমনলাল। তাতে অসুখের কথা লেখা নেই, লেখা আছে সীরিয়াসলি উণ্ডেড।

—আপনার তো তা হলে বাড়িতে যাওয়া দরকার, তাই না ? আপনি নতুন জয়েন করেছেন···

বস্তুত ঝিল্লি রায় এই অফিসে যোগ দিয়েছে ঠিক উনত্রিশ দিন আগে, এখনো এক মাসও পূর্ণ হয়নি। এই রকম অবস্থায় ছুটি পাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু চিমনলাল হৃদয়হীন শাসক নয়।

—আপনি একটা দরখাস্ত টাইপ করে দিন, আপনাকে ১৫ দিনের বিশেষ ছুটি দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। উইথ পে। শুধু শুধু কেঁদে তো কোনো লাভ নেই।

চিমনলাল নিজের চেম্বারে ঢুকে আংটিটা নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল।

মালিকের এই উদারতায় অবশ্য সব সমস্যার সুরাহা হলো না ঝিল্লির। বোম্বে থেকে ট্রেনের টিকিট পাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। তা ছাড়া ঝিল্লির হাতে টাকাও নেই। আর দুটো দিন কাটলে সে এক মাসের মাইনে পাবে। তার পরে গেলে ততদিনে তার দাদার অবস্থা কী হবে কে জানে। কিছু টাকা ধার করবে ? কার কাছ থেকে ?

আবার তার কান্না এসে যায়। কিন্তু সহকর্মীরা ফিরে এলে আর কান্না চলবে না। দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করে যেতে হবে।

বিকেল সাড়ে চারটের সময় তার ডাক পড়লো চিমনলালের ঘরে।

—ছুটির দরখাস্ত করেছেন ?

—হ্যাঁ, স্যার।

দুটি খাম টেবিল থেকে তুলে নিল চিমনলাল। তার মধ্যে একটি খামে ছবি আঁকা।

—এই নিন্ এটাতে আছে প্লেনের টিকিট। আজ সন্ধের ফ্লাইট পাওয়া গেল না, কাল একটার ফ্লাইটের টিকিট এটা। এক ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে যাবেন। আর এতে এক হাজার টাকা আছে। আশা করি এতে কুলিয়ে যাবে।

ঝিল্লি প্রথমে কথাই বলতে পারলো না। এ কি স্বপ্ন না মায়া? প্লেনের টিকিট? সে জীবনে কখনো প্লেনেই চাপেনি। আর এক হাজার টাকা? তার মাসের মাইনেই আটশো পনেরো টাকা।

—স্যার, আপনি, আপনি আমাকে এসব দিচ্ছেন? কেন?

—কেউ বিপদে পড়লে আমার যদি সাহায্য করতে ইচ্ছে করে, তবে সেটা কি দোষের?

—কিন্তু এত টাকা···আমি শোধ করবো কী করে···

—পরে আস্তে আস্তে শোধ হয়ে যাবে। আপনি থাকেন কোথায়?

—একটা হস্টেলে, ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেল।

—সেটা কোথায়?

—সেন্ট্রাল দাদার।

—এখানে আপনার কোনো আত্মীয় বা বিশেষ চেনা কেউ আছে? এ কথা জিজ্ঞেস করছি, তার কারণ, এ রকম একটা গুরুতর খবর পাবার পর আপনার আজ সন্ধেবেলা একা থাকা উচিত নয়।

—না, সে রকম কেউ নেই। তবে···কোনো অসুবিধে হবে না, আমি ঠিক থাকতে পারবো।

—উহুঁঃ! সেটা কোনো কাজের কথা নয়। ফর আ লোনলি পার্সন, বম্বে ইজ আ ডেইঞ্জারাস সিটি। চার পাশে সবাই ব্যস্ত কিংবা আমোদ করছে, আপনি একা একা ব্রুড করবেন···হ্যাট উইল বী ভেরি ব্যাড ফর ইয়োর মেন্টাল হেল্‌থ···। আজ সন্ধেবেলা আপনাকে একটা গেট-টুগেদারে নিয়ে যাবো, আমি ইনসিস্ট করছি, আজ সন্ধেটা আপনি আমার সঙ্গে কাটাবেন।

—কিসের গেট টুগেদার ? সেখানে অনেক লোক থাকবে ?

—হ্যাঁ। অনেকে আসবে, আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছে হয় কথা বলবেন, অথবা বলবেন না, গান শুনবেন। আপনি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। তারপর···

—স্যার, আমি বলছিলাম—

—শুনুন, মিস রায়, আপনার দাদা খুব অসুস্থ, জানি। ওটা ফল্‌স্ টেলিগ্রাম নয়। অনেকে ছুটি নেবার জন্য বাড়ি থেকে ফল্‌স টেলিগ্রাম আনায়, তাতে সাধারণত লেখা থাকে 'মাদার সীরিয়াসলি ইল।' শুনুন, আপনার দাদা খুব অসুস্থ, কিন্তু দেড় হাজার মাইল দূরে বসে আপনি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করে তো তার কোনো সাহায্য করতে পারবেন না ? বলুন ? যত তাড়াতাড়ি আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশী কিছু আর করা যায় না। কাল ইভিনিং-এ আপনি পৌঁছে যাবেন বাড়িতে। আজ ইভিনিংটা আপনি নষ্ট করবেন কেন ? ঠিক সাড়ে সাতটায় আপনি দাদার স্টেশনের কাছে আসবেন, ওখানে আমার গাড়ি থাকবে, কেমন ? ঠিক আছে ?

এতখানি উপকার যিনি করেছেন, এর পর আর তাঁকে কী ভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় ? তা ছাড়া চিমনলালকে খুব একটা খারাপ লোক মনে হয় না। এরা নতুন জেনারেশানের মাড়োয়ারী, এদের ব্যবহার সাহেবদের মতন ভদ্র।

ঝিল্লি চলে যাবার আগে চিমনলাল আবার বললো, আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি অনুমতি করলে জিজ্ঞেস করতে পারি।

—হ্যাঁ বলুন।

—আপনার দাদা অসুস্থ নন্। আহত। কী ব্যাপারে তিনি আহত হতে পারেন, সে সম্পর্কে কি আপনার কোনো ধারণা আছে ?

একটুক্ষণ দ্বিধা করলো ঝিল্লি। তারপর বললো, আমাদের কিছু জমির ব্যাপারে একজনের সঙ্গে ঝগড়া আছে, হয়তো সেই ব্যাপারেই··· এখন ধান কাটার সময় কি না···

—হি ইজ নট্ ওয়ান অব দোজ নক্সালাইটস ?

—ন্ না!

—ঠিক আছে। টিল্ সেভেন থার্টি।

দাদার স্টেশনে ঝিল্লি ঠিক সময়ে এসে দেখলো, চিমনলাল আগেই এসে গেছে। দিনের বেলা অফিসের ড্রাইভার থাকে, এখন গাড়ি চালাচ্ছে সে নিজে।

গাড়িতে ওঠার পর ঝিল্লি বললো, স্যার, একটা কথা বলছি—

—দয়া করে, আমরা যেখানে যাবো, সেখানে আমাকে স্যার বলে ডাকবেন না। আপনি আমাকে স্বচ্ছন্দে চিমনলালজী বলতে পারেন, ঐ নামেই অফিসের বাইরে সবাই আমায় ডাকে।

—আমি বলছিলাম যে, আমি কখনো কোনো পার্টি টার্টিতে যাইনি· লোকের সঙ্গে কী রকম ভাবে কথা বলতে হয় জানি না···

—আপনার যখন ঠিক যে-কথাটা মনে আসবে, সেটাই বলবেন। তাতেই চলবে। অবশ্য, কারুকে দেখে যদি আপনার বাঁদরের মতন মনে হয়, সেটা তার মুখের ওপর বলে দেবেন না।

একটা দোতলা বাড়িতে ওপর তলায় চারখানা ঘরের ফ্ল্যাট। একদম বাড়ির পাশেই সমুদ্র।

চারখানা ঘর জুড়েই পার্টি চলছে। অন্তত চল্লিশজন নানা বয়েসের নারী পুরুষ। অনেকের হাতে মদের গেলাস, কেউ কেউ অবশ্য নরম পানীয়ও নিয়েছে। ঘরগুলো সিগারেটের ধোঁয়াতে ভর্তি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চিমনলাল বলেছে, মিস্ রায়, আমি সবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেবো না। আপনার যাকে যাকে পছন্দ হবে, আপনি নিজেই আলাপ করে নেবেন। কেমন?

ভেতরে এসে একটি শেষ বয়েসের যুবতী মহিলার কাছে প্রথমে এসে চিমনলাল বললো, পুনম্, এ আমার বন্ধু শ্রীমতী ঝিল্লি রায়। আগে এত লোকের পার্টিতে আসেনি। ইউ প্লীজ চীয়ার হার আপ্।

তারপর ঝিল্লির দিকে ফিরে বললো, আপনাকে যে মদ খেতেই হবে, তার কোনো মানে নেই। একেবারে অভ্যেস না থাকলে আজ না খাওয়াই ভালো।

তারপর সে মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

পুনম্ ঝিল্লির হাত ধরে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলো, আর ইউ এ গুজরাটি ?

—নো, আই অ্যাম বেঙ্গলি।

—তবে যে বললো রাই।

– রাই না, রায়।

—ওঃ! আই লাভ বেঙ্গলিজ। দে আর সো নাইস পীপ্‌ল। সো ইনটেলিজেণ্ট। শোনো ডার্লিং, আমি হলাম চিমনলালের তিন নম্বর বন্ধু, তুমি প্রোবাব্‌লি সতেরো কিংবা আঠেরো নম্বর। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই, অ্যাঁ? ঐ দ্যাখো, চিমন এখন উনিশ নম্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।

ঝিল্লি পেছন ফিরে দেখলো, ঘরের এক কোণে একটা টকটকে লাল স্কার্ট পরা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে চিমনলাল।

চিমনলাল কেন ঝিল্লিকে তার বন্ধু বলে পরিচয় দিল? আজকের দিনটা ছাড়া চিমনলালের সঙ্গে তার তো আর কোনোদিন কথাই হয়নি। এমনকি চিমনলাল যে তার নাম জানে, এ ধারণাই ছিল না ঝিল্লির।

ঘরের দেয়ালগুলোতে অসংখ্য ছবি। কিছু হাতে আঁকা রঙীন, আর বেশীর ভাগই ফটোগ্রাফ। কোনোটাই বাঁধানো নয়, সবই সেলোটেপ দিয়ে আটকানো। অনেক লোকের এক সঙ্গে কথা বলার একটা গুনগুন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

পুনম বললো, চলো, আগে তোমাকে মিঃ চাওলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। নাম শুনেছো তো, হরিশ চাওলা?

ঝিল্লি ঐ নাম শোনেনি।

পুনম তার আঁকা ভুরু ছুটি ধনুকের মতন তুলে বললো, সে কি! হরিশ চাওলা দারুণ নাম করা ফটোগ্রাফার। ওয়ালর্ড ক্লাস! ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ ওর ছবি রেগুলার ছাপা হয়।

হরিশ চাওলাই এই ফ্ল্যাটের মালিক। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল তৃতীয় একটি ঘরে। সে যে কোন্ জাতের মানুষ তা বোঝবার উপায় নেই। গায়ের রং সাহেবদের মত লালচে ফর্সা, মুখে গোল মরিচ রঙের

দাড়ি, মাথার চুলও সেই রঙের। মানুষটি বেঁটেখাটো, কিন্তু বেশ শক্তিশালী গড়ন, চওড়া বুক। জিনিসের ওপর একটা আলখাল্লার মতন গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী পরা, মুখে লম্বা চুরুট, হাতে মদের গেলাস। পাঁচ ছ'জন নারী পুরুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র হয়ে তার কথা শুনছে।

পুনম তার পাশে গিয়ে তার কাঁধে টোকা দিল দু'বার।

চাওলা মুখ ফেরাতেই সে বললো, হরিশ, এই আমাদের একজন নতুন বন্ধু এসেছে, মিট মিস্ ঝিল্লি রায়।

চাওলা একেবারে পাত্তাই দিল না। শুকনো ভাবে, ও, হ্যালো, বলেই আবার মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে লাগলো অন্যদের সঙ্গে। সুইজারল্যাণ্ডের কোনো একটা পাহাড় বিষয়ে সে কথা বলছে।

খানিকক্ষণ সেখানে বোকার মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো ঝিল্লি। ওদের ভাষাই যেন সে বুঝতে পারছে না। একবার তাকিয়ে দেখলো পুনম চলে গেছে সেখান থেকে। চিমনলালকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে তার একটুও ভালো লাগছে না। ঘরের এক কোণে একটা সোফা খালি আছে দেখে সে সেখানে গিয়ে বসে পড়লো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি যুবক এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, মে আই ইনট্রোডিউস মাইসেল্‌ফ? আমার নাম রঙ্গীন। নমস্কার। আপনি?

ঝিল্লি নমস্কার করে নিজের নাম জানালো।

রঙ্গীন বললো, আপনার পাশে একটু বসতে পারি? একি, আপনার হাতে গেলাস নেই কেন? হোয়াট ইজ ইওর পয়জন? জিন, ভদকা রাম, হুইস্কি?

—ধন্যবাদ। আমার কিছু লাগবে না।

—না, না। একটা কিছু নিন। সফ্‌ট কিছু নেবেন? দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি। সাঁ করে প্রায় ছুটে চলে গেল ছেলেটি।

এক হিসেবে ঝিল্লির খুব খারাপ লাগছে না। তার মধ্যে কৌতূহল-বৃত্তি খুব প্রবল। এখানে এতগুলো মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়েছে কী উপলক্ষে? কারুর বিয়ে বা জন্মদিন বা ঐ রকম কিছুও তো নয়।

এমনি এমনি বিনা কারণে এত লোক ডেকে কেউ খাওয়ায়! কত বিচিত্র ধরনের পোষাক, কত রকম মুখ! এত বছর বোম্বাইতে থেকেও সে আগে কখনো এই ধরনের সমাবেশ দেখেনি। এত লোক মিলে মদ খাচ্ছে, এর নিশ্চয়ই অনেক খরচ। এরা এত টাকা এমনি এমনি উড়িয়ে দেয়। অথচ ঝিল্লির কাছে কলকাতা যাওয়ার ট্রেন ভাড়া ছিল না। মিঃ চিমনলাল সত্যিই ভালো লোক। অফিসের সাধারণ একজন টাইপিস্টকে এত টাকার টিকিট, আর এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স।

দাদা আহত, দাদাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে? কোথায় মেরেছে, কতটা মেরেছে? এতক্ষণ দাদা···কিন্তু কালকের আগে তো ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই! দাদা, তোকে বেঁচে থাকতেই হবে, আমি পৌঁছোনো অবধি তুই বেঁচে থাকবি।

রঙ্গীন ফিরে এলো হাতে একটা ঠাণ্ডা পানীয়র বোতল নিয়ে।

আফশোসের সঙ্গে বললো, অনেক খুঁজেও গেলাস পেলুম না। আপনি এটা থেকেই চুমুক দিন!

এই ছেলেটির বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ হবে, মাথা ভর্তি উস্কো-খুস্কো চুল, গায়ের জামাটা গাঢ় হলুদ রঙের। এখানকার অনেকেরই পোষাকে রঙের আধিক্য। চিমনলাল অবশ্য দুধ-সাদা প্যাণ্ট আর সাদা হাওয়াই সার্ট পরে এসেছে।

রঙ্গীন বললো, আমি ফিল্মের ডায়ালগ লিখি। কাঁচ কী পনছী, এখন হিট ছবি চলছে, দেখেছেন? ওর ডায়ালগ আর লিরিক্স আমার। আপনি?

ঝিল্লি জানালো যে সে অতি সাধারণ একটা চাকরি করে।

—চাকরি! হ্যাট্‌স আ পিটি! আপনার মডলিং-এ যাওয়া উচিত ছিল। আপনার সঙ্গে দুলালজীর আলাপ আছে? নেই? আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারি আপনি যদি ফিল্মে ইণ্টারেস্টেড হন··· ঐ যে দেখছেন, উনি বাসুদেব মুখার্জি, ওর নেক্সট ছবির জন্য আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট হবে·

ফস করে পকেট থেকে নিজের নাম ছাপানো একটা কার্ড বার করে

সে আবার বললো, একদিন আসুন না আমার ফ্ল্যাটে, আমি একা থাকি, যে কোনো সময় ফার্স্ট গীভ মি আ রিং বিফোর ইউ কাম

কার্ডে লেখা শুধু রঙ্গীন। পদবী-টদবী কিছু নেই।

এই সময় চিমনলাল সেখানে এসে ঝিল্লিকে বললো, সব ঠিক আছে তো? এই তো একজন গল্প করার লোক পেয়েছেন। রঙ্গীন কথা বলতে শুরু করলে সারা রাত কাবার করে দিতে পারে। ডায়ালগ রাইটার তো, তাই কথায় ওস্তাদ।

রঙ্গীন বললো, আপ সে বড়া ওস্তাদ কৌন হ্যায়। এই সুন্দরীটি আপনার সঙ্গে এসেছে, বাপরে, আগে জানলে সমঝে কথা বলতুম।

চিমনলাল হাসতে হাসতে বললো, কই ফিকর নেহি। গো অ্যাহেড।

কিন্তু এরপর রঙ্গীন চঞ্চল হয়ে উঠলো, এবং একটু পরেই কিছু একটা ছুতো দেখিয়ে উঠে গেল সেখান থেকে।

আবার আর একজন এলো ভাব জমাতে।

এই রকম ভাবে প্রায় ঘণ্টা দু' এক কেটে গেল। এর মধ্যে অনেকে চলে গেছে, অনেকে এসেছে, কয়েকজন বেশ মাতাল হয়ে উঠেছে। ঝিল্লিকে এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এগারোটার সময় হস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যায়।

চিমনলাল আবার এসে বললো, আপনি একই জায়গায় বসে আছেন? এখানে ঘুরে ঘুরে কথা বলতে হয়। আসুন, একজন আপনাকে দেখতে চাইছে।

—আমার এখন বাড়ি গেলে ভালো হয়।

—যাবেন, নিশ্চয় যাবেন। আসুন একটু!

চিমনলাল তাকে নিয়ে গেল চতুর্থ ঘরে। এখানে ভিড় কম। হরিশ চাওলা একটি মেয়ের দু'কাঁধে দুটি হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ঘরের মধ্যে আরও তিনজন ব্যক্তি গভীর আলোচনায় মগ্ন। তাদের মধ্যে একজন সেই বাসুদেব মুখার্জি। তিনি বাঙালী হলেও ঝিল্লির নাম শুনে কোনো রকম বাঙালী-প্রীতি দেখালেন না। এমনকি ভাষাও

বদলালেন না। ইংরেজিতেই ভদ্রতা করে বললেন, ঠিক আছে, নেক্সট উইকে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ঝিল্লি একটু অপমানিত বোধ করলো। ইনি চিত্র পরিচালক, ইনি কি ভেবেছেন, ঝিল্লি সিনেমায় নামতে চায়? মোটেই না। ছি ছি! যে-কোনো মেয়ে দেখলেই বোধহয় এরা এই কথা ভাবেন?

চিমনলাল বললো, মুকুর্জিসাব, এই ভদ্রমহিলাকে প্র্যাকটিক্যালি আজই আমি প্রথম দেখেছি। মানে আগেও দেখেছি, লক্ষ্য করিনি। আজকে সী ওয়াজ ক্রাইং। অ্যাণ্ড ইট ওয়াজ সো জেনুইন। আজকাল ক'জন জেনুইন ভাবে কাঁদতে পারে, বলুন?

রোগা, লম্বা চেহারার মুখার্জি সাহেবের মুখখানি শুকনো। তিনি অন্য কোনো চিন্তায় কাতর। তিনি সাহেবী কায়দায় বললেন, হাঁ, হাঁ।

তারপর কিছু যেন একটা মনে পড়েছে, এইভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। বাকি লোক দু'জনও গেল পেছন পেছন।

হরিশ চাওলা ডাকলো চিমনলালকে। তার সঙ্গিনী ঝিল্লির দিকে এগিয়ে এসে খুব মিষ্টি গলায় একটা প্রশ্ন করলো, তোমার বয়েস কত ভাই?

ঝিল্লি বললো, উনিশ।

—অ্যাণ্ড ইউ লুক এগজ্যাক্‌ট্‌লি নাইনটিন। হাও ইনক্রেডিবল্‌। আচ্ছা, আন্দাজ করো তো আমার বয়েস কত।

ঝিল্লি হেসে ফেললো। কেউ কারুর নাম জানে না, প্রথমেই বয়েসের প্রশ্ন। এই মেয়েটি ঝিল্লির চেয়ে অনেক বড় নিশ্চয়ই। মুখখানাতে এত প্রসাধন যে আসল মুখটা বোঝবার উপায় নেই। লম্বাতে ঝিল্লির চেয়ে ছোট।

ঝিল্লির মনে হলো, ঐ মেয়েটির বয়স বছর তিরিশের হবেই অন্তত, তবু সে ভদ্রতা করে কমিয়ে বললো, আপনি বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ তাই না?

—আই অ্যাম থার্টি ফাইভ। তবে! মেয়েদের যা আসল বয়েস, তার চেয়ে অনেক কম বয়েস মনে হওয়া উচিত, অন্তত পুরুষদের চোখে। ইউ সুড্‌ লুক সিক্সটিন, সুইট সিক্সটিন। তার কম নয় অবশ্য,

তার কম হলে পুরুষরা পাত্তা দেয় না।

এই আলোচনা একটুও পছন্দ হলো না ঝিল্লির। শুধু বয়েস আর শরীর। পুরুষদের চোখে কেমন দেখাবে, সেটাই কি মেয়েদের একমাত্র চিন্তা হবে?

ঝিল্লি এখন এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচে। তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিচিত্র কিছু মানুষ দেখা গেল।

এবার হরিশ চাওলা এদিকে কী যেন খুঁজতে এলো। এটা বোধহয় তার কাজের ঘর। এখানে নানা রকম ক্যামেরা ও অনেক-গুলো আলো রয়েছে।

ঝিল্লির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা তার দিকে বাঁকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, রিয়েল?

এ প্রশ্নের মানেই বুঝতে পারলো না ঝিল্লি, উত্তর কী দেবে?

চাওলা এবার গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হেই চিমন, আর দিজ্ টিট্স রিয়েল?

চিমন্‌লাল ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, আমি সার্টিফাই করতে পারবো না। কারণ নট ইয়েট টেস্টেড বাই মি।

চাওলা এবার অন্য মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, প্যাডিং আছে?

সে বললো, আই ডোন্ট থিংক সো। ও বললো, ওর বয়েস উনিশ। তা হলে হতে পারে।

—ফীল ইট্।

ঝিল্লিকে দারুণ চমকে দিয়ে সেই মেয়েটি তার দুই হাত রাখলো তার দুই স্তনে।

রাগে লজ্জায় ঝিল্লির তক্ষুণি মরে যেতে ইচ্ছে হলো। এই মেয়েটি কি পাগল? অন্য দু'জন পুরুষের সামনে···। সে এক ঝটকায় মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল নিজে।

মেয়েটি চাওলাকে জানালো তার পরীক্ষার ফলাফল, পারফেক্ট্‌লি ন্যাচারাল।

—সিওর?

—কোয়াইট সিওর!

চাওলা ঝিল্লির একটা হাত ধরে জোর করে টেনে আনলো দেয়ালের পাশে। সেখানে দাঁড় করিয়ে সে ফটাফট করে জ্বেলে দিল কয়েকটা ফ্ল্যাডলাইট।

এক আঙ্গুলে ঝিল্লির থুতনিটা ঠেলে তুলে ধরে চাওলা বললো, হাত দুটো মাথার ওপর তোলো তো খুকী।

ঝিল্লি রাগের সঙ্গে বললো, এসব কী হচ্ছে?

চিমনলাল বললো, হরিশ চাওলা আপনার একটা ফিগার টেস্ট নেবে।

—কে বলেছে টেস্ট নিতে? আমি মোটেই চাই না।

—আপনার অ্যালার্মড হবার কিছু নেই, মিস রায়। খুব সিম্পল ফটোগ্রাফিক টেস্ট।

—প্লিজ, আমি বাড়ি যেতে চাই এখন।

বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে নিস্পৃহভাবে দাঁড়িয়ে আছে চাওলা। এবার সে বললো, বেবী, ইউ মে নট নো, কিন্তু আমার সময়ের যথেষ্ট দাম আছে। হাত দুটো চটপট মাথার ওপর তোলো।

ঝিল্লি দৃঢ় গলায় বললো, না!

—অল বেঙ্গলিজ আর হিপোক্রিট্স। সিউডো-ইণ্টেলেকচুয়ালস্। শেষ পর্যন্ত রাজি হবে ঠিকই, শুধু শুধু সময় নষ্ট।

অন্য মেয়েটি বললো, আহা, ওকে বোকো না। বেচারী প্রথম এসেছে। মাই ডিয়ার গার্ল, তোমার ভয় পাবার তো কিছু নেই। মিঃ চাওলা তোমার ছবি তুলতে চাইছেন, এতো ভাগ্যের কথা!

—আমি ছবি তোলাতে চাই না।

চাওলা বললো, অল রাইট, রিলাক্স!

আলোর কাছ থেকে সরে এসে সে আবার বললো, সোনিয়া, গিভ হার সামথিং টু ড্রিংক। আমাদেরও গেলাস খালি।

চিমনলালকে সে বললো, ঐ দুটো জিনিস যদি রিয়েলি রিয়েল হয়, তা হলে, ও জানে না কী মূল্যবান সম্পদ ও বক্ষে বহন করছে।

ঝিল্লি বললো, আমি এবার বাড়ি যেতে চাই।

চিমনলাল বললো, নিশ্চয়ই। গীভ মী অ্যানাদার ফিফটিন মিনিটস্। আমি পৌঁছে দেবো।

—আমি নিজেই চলে যেতে পারবো।

—না-না রাত হয়ে গেছে, এদিকের রাস্তা খারাপ।

সোনিয়া সকলের গেলাস ভরে দিচ্ছে। ঝিল্লিকেও একটা গেলাস এনে দিল।

ঝিল্লি বললো, মাপ করবেন, আমি ওসব কিছু খাই না।

—জানি, আপনি অ্যালকোহল খাচ্ছেন না। এটা সরবৎ। এটার মধ্যে এক ফোঁটাও অ্যালকোহল নেই। টেস্ট করে দেখুন।

—না, না, আমার চাই না।

চিমনলাল বললো, খেয়ে দেখুন না। একদম নিরামিশ। আমার হাতের এইটা শেষ করেই আমরা বেরিয়ে পড়বো।

সোনিয়ার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে ঝিল্লি প্রথমে একটা ছোট চুমুক দিল। মিষ্টি মিষ্টি বেশ খেতে, কোনোরকম ঝাঁঝ নেই। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। আবার চুমুক দিল সে।

ঝিল্লির যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখলো, সে একটা ফাঁকা ঘরে শুয়ে আছে। নরম বিছানা, একটা সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকা। সেই চাদরের নিচে তার শরীরে কোনো পোষাক নেই।

ঘরের আলোতে বোঝা যায় রাত্রি পেরিয়ে আর একটি দিন এসেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসলো সে। একটা প্রবল ভয় যেন এখুনি তার গলা টিপে মেরে ফেলবে। সে কোথায়? কে তার এই সর্বনাশ করলো? কিছুই মনে পড়ছে না, মাথাটা ভারি···ও, কাল সে চিমনলালের সঙ্গে···।

দাদার কাছে আর যাওয়া হবে না? এতক্ষণে দাদা···। বুক ফেটে কান্না বেরতে চাইলেও এখন কান্নার সময় নয়।

চাদরটা জড়িয়ে নেমে এলো খাট থেকে। প্রথমেই হাত দিল দরজায়। না, দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ নয়। দরজার পাশেই বাথরুম, সেখানে ঝিল্লির শাড়ী-ব্লাউজ সব পাট করে রাখা আছে।

পোষাক পরে নিয়ে ঝিল্লি বেরিয়ে এলো বাইরে। এ তো সেই

চাওলার ফ্ল্যাট। মনে হয় কোনো লোকজন নেই। কোনো শব্দ নেই। পাশের ঘরে প্রচুর এঁটো গ্লাস পড়ে আছে। তার পাশের ঘরটাতে হরিশ চাওলা একা বসে, অনেকগুলো আলো জ্বেলে কয়েকটি ছবি দেখছে।

ঝিল্লির প্রথম ইচ্ছেটাই হলো, কোনো একটা ভারী জিনিস তুলে নিয়ে পেছন থেকে গিয়ে হরিশ চাওলার মাথাটা ভেঙে চুরমার করে দেয়।

চাওলা মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললো, হ্যালো! তোমার ঘুম ভেঙেছে? বাবাঃ, কাল আমাদের খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। কাল তোমার কী হয়েছিল?

ঝিল্লি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চাওলা তাকে একথা জিজ্ঞেস করছে? কাল কী হয়েছিল তা ঝিল্লি জানে না ওরা জানে?

ঝিল্লিও সেই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করলো।

চাওলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, ইউ বিহেইভ্‌ড ভেরি স্ট্রেঞ্জলি! সোনিয়া তোমায় যে ড্রিংকটা দিয়েছিল, খুব সম্ভবত তাতে খানিকটা জিন মিশে গিয়েছিল। দ্যাট্‌স নাথিং। ঐটুকু জিনে কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু তুমি এমন ফানি ব্যবহার করতে লাগলে···হাসতে লাগলে জোরে জোরে, উঠে নাচ শুরু করলে·· ঠিক পাগলের মত।

—আমি?

—ইয়েস! তোমার বয়-ফ্রেণ্ড চিমনলাল তোমাকে সামলাবার অনেক চেষ্টা···

—বয়ফ্রেণ্ড? চিমনলাল মোটেই আমার বয়ফ্রেণ্ড নয়।

—ইউ কেইম উইথ হিম, ডিড্‌ন'ট ইউ? বাবা-কাকার সঙ্গে কেউ ড্রিংকসের পার্টিতে আসে না। তুমি তোমার শাড়ী খুলে ফেলবার চেষ্টা করলে, কেউ তোমাকে থামাতে পারছিল না।

—মিথ্যে কথা! এ সব মিথ্যে কথা!

হরিশ চাওলা আবার ছবি দেখায় মন দিল। সেগুলো সব ঝিল্লির ছবি। প্রত্যেকটিই তার নগ্ন শরীরের।

একটি ছবি তুলে ধরে হরিশ চাওলা বললো, তুমি তোমার ছবি তোলাতে চাইছিলে। এই দ্যাখো। কেমন হয়েছে?

ঝিল্লি তার অসহায় দুঃখ-মাখা মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললো, আপনি কেন আমার এই সর্বনাশ করলেন ?

—ইউ ইনসিস্টেড ! প্রমাণ চাও ? শোনো !

টেবিলের ওপরের একটা যন্ত্রের বোতাম টিপলো হরিশ চাওলা। অমনি টেপ রেকর্ডে শোনা গেল ঝিল্লির গলা···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ছবি তুলুন···প্লীজ···হ্যাঁ তুলুন, এই যে আমি পোজ দিচ্ছি···এবার কি করবো, শুয়ে পড়বো ? হাঃ হাঃ হাঃ ! এই, না, না, শুড়শুড়ি লাগছে···

এবারও ঝিল্লি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার নিজের গলা। সে সত্যিই এইসব কথা বলেছে ? এও কখনও সম্ভব ? তার কোনো দিন ছবি তোলার লোভ নেই, তাও এই অবস্থায়। না, না, মিথ্যে, এসব মিথ্যে, এসবই ওদের সাজানো ষড়যন্ত্র !

ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরিয়ে চাওলা বললো, শুনুন, মিস্ রায়, আপনাদের বাঙ্গালী ভাষা আমি জানি না। তবু, ঐ টেপে প্রমাণ আছে যে আপনি নিজে আমাকে ছবি তোলাতে রিকোয়েস্ট করেছেন। আই অ্যাম আ প্রফেশনাল ম্যান, ছবি তোলা আমার কাজ, এইসব ছবি তোলার জন্য যদি আপনার কাছে আমি ফি চাই, তা দেবার সাধ্য আপনার নেই।

—আমি এই রকম নোংরা, কুৎসিত ছবি তুলতে চাইবো কেন ?

—কোনো ছবিই নোংরা, কুৎসিত নয়। হিউম্যান ফিগার ইজ হিউম্যান ফিগার। চিমনলালের কাছে শুনলুম, আপনার এলডার ব্রাদার খুব অসুস্থ এই খবর আপনি পেয়েছেন, সেইজন্য মেণ্টালি খুব আপসেট ছিলেন, ব্যালান্স রাখতে পারেন নি। যাক্, উই ক্যান ফরগেট অ্যাবাউট দা হোল থিং, আচ্ছা ? এবার আমার কিসে ইণ্টারেস্ট সেটা বলি। এই ছবিটা দেখছেন ?

চাওলা একটা ব্লো আপ করা ছবি তুলে ধরলো। সেটাতে দেখা যাচ্ছে একজন নারীর শুধু দুটি স্তন। প্রথমে ঠিক বোঝা যায় না, মনে হয় দুটি জামবাটি, কিংবা দুটি সার্চ লাইট।

চাওলা একটা পেনসিল দিয়ে সেটার ওপর দাগ কেটে বললো, মিস্ রায়, আপনি এমন কিছু সুন্দরী নন, ঢের ঢের সুন্দরী মেয়েআমার কাছে,

আসে বিরক্ত করবার জন্য। দিস ইজ বম্বে, এখানে মেয়ের অভাব নেই। আমার ক্যামেরার চোখে আপনি এখন যে অবস্থায় জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে ইউ আর এ ভেরি অর্ডিনারি গার্ল! রাইট? সুতরাং আপনার সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকবার কোনো কারণ নেই। দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ঐ চেয়ারটায় বসুন!

—আমাকে আপনারা বিষ খাইয়েছিলেন!

—সিলি গার্ল। ওসব কথা বলতে নেই। চিমনলালের আপনার প্রতি খানিকটা ফ্যাসিনেশান হয়েছিল, তার কারণ ও আপনাকে কাঁদতে দেখেছে। দ্যাট্ ফেলো ইজ ম্যাড অ্যাবাউট উইমেন ইন অ্যাগোনি। একমাত্র জেনুইন কোনো দুঃখী মেয়ে দেখলে ওদের সেক্স জাগে। তাকে হেল্প-ও করে, এক্সপ্লয়েট-ও করে। বুঝলেন! দুঃখ নিয়েই ওর কারবার। থাক, দ্যাট ইজ হিজ বিজনেস। যাক্, আপনি ভাববেন না যে আমার এখানে ঐসব কাজের আমি প্রশ্রয় দিই। আপনি আমাকে ছবি তোলাতে বলেছেন

—আমি কক্ষনো বলিনি!

—আগে আমাকে শেষ করতে দিন। জোর করে আপনার ছবি তোলার কোনো স্বার্থ আমার নেই। যদি ন্যুড ছবির কথা বলেন, আমি এক্ষুনি আপনাকে অন্তত আড়াইশোটি মেয়ের এরকম অন্তত পাঁচ ছ'হাজার নেগেটিভ দেখাতে পারি। পার্ডন মাই সেইং, ইয়োর লেগ্‌স আর নট ওয়েল শেপ্‌ড। নাও, আই অ্যাম কামিং টু দা পয়েণ্ট আপনার বয়ফ্রেণ্ড চিমনলাল প্রথমে আপনার ছবি তোলার কথা সাজেস্ট করে আমি প্রথমে আমল দিইনি, তবে আপনার ব্রেস্টের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, যদি রিয়েল হয়। এই দেখুন আপনার ব্রেস্টের ছবি। জানেন তো, মেয়েরা কখনো নিজেদের ব্রেস্ট দেখতে পায় না? এমনকি আয়নাতে দেখলেও ঠিক ডায়মেনশান বোঝা যায় না। অর্থাৎ কোনো মেয়েই তার নিজের স্তনের আকার জানে না। আপনিও জানেন না, আপনার বক্ষদেশে কী ঐশ্বর্য আছে। হিউম্যান ফিগারের ব্যাপারে আমাকে একটি জহুরি বলতে পারেন· এই যে পেয়ার অব টিট্‌স, এই রকম সম্পূর্ণ রাউণ্ড, ইউনিফর্মলি পরট্রুডিং

এরকম ওয়ান ইন আ মিলিয়ান-এও দেখা যায় না। ভেরি রেয়ার। আমাদের কুমোররা মাটি দিয়ে ঠাকুর দেবতার যে-সব মূর্তি তৈরি করে ··লক্ষ্মী··সরস্বতী· ঠিক এইরকম। এই ধরনের ব্রেস্ট অ্যাড-মডেলিং-এর জন্য আইডিয়াল। পৃথিবীর যে-কোনো দেশ এই রকম মডেলের ছবি পেলে লুফে নেয়। মিস রায়, হরিশ চাওলা ইজ গিভিং ইউ আ কমপ্লিমেণ্ট। প্রকৃতি আপনার শরীরে এক জোড়া সুন্দর উপহার রেখে দিয়েছে। এবার আপনার প্রতি আমার অফার রইলো, আপনি যদি আমার এখানে মডেলিং করতে চান, আই উইল পে ইউ হ্যাণ্ডসামলি। নগ্ন ছবি তোলানোর সঙ্গে কিন্তু নোংরামির কোনো সম্পর্ক নেই। আমি কিংবা আমার এখানে কেউ আপনার শরীর একবারও স্পর্শ করবে না। আবার আপনাকে বলছি, আই অ্যাম নট্ আ লেচারাস পার্সন, আমি একজন প্রফেশ্নাল ফটোগ্রাফার, আই ডোনট্ ইনডাল্জ ইন এনি ডার্টি বিজনেশ ইন হিয়ার··

—ঐ সবগুলো ছবি এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলুন!

—তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হরিশ চাওলার ছবি ছিঁড়ে ফেলার জন্য তোলা হয় না।

—ঐ সব নোংরা ছবি ।

নোংরা কথাটা উচ্চারণ করবেন না, আমার কানে লাগে। শুনুন, আজ আপনার প্লেন ধরে কলকাতায় যাবার কথা। আর বেশী সময় নেই, ইউ বেটার হারি । আপনি ঘুরে আসুন। তারপর আপনার সঙ্গে কথা হবে। তার আগে আপনার পারমিশান ছাড়া এই ছবি একটাও আমি ব্যবহার করবো না। আশা করি আপনার দাদা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। গুড লাক্।

লেখকের মুখোমুখি

কামপারির বোতলটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লেখকই বেশী খেয়েছেন, ঝিল্লি সেই একই গেলাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু।

হঠাৎ মুখ তুলে ঝিল্লি জিজ্ঞেস করলো, সে সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

—কোন্ সময় ?

—বাংলাদেশ নিয়ে যুদ্ধ লাগবার ঠিক আগের বছর ?

—কলকাতাতেই ছিলাম।

—আপনি ওদের কারুকে চিনতেন ?

—ব্যক্তিগতভাবে অনেককেই চিনতুম। আমারই কোনো কোনো বন্ধুর ভাই ঐ দলে যোগ দিয়েছে। তা ছাড়া আরও অনেকে···হ্যাঁ, আমার চেনা কয়েকজন হারিয়ে গেছে, কয়েকজন দীর্ঘকাল জেল খেটেছে, এক সময় দু'জন পালিয়ে থাকা অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিল আমাদের বাড়িতে···

—ওদের প্রতি আপনার কী মনোভাব ছিল ?

—মনে মনে সমর্থন ছিল যথেষ্ট। বিপ্লবের চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে না, এমন কোনো লেখক হতে পারে ?

— শুধু মনে মনে সমর্থন ?

—আমাদের ওরা দূরে সরিয়ে রাখে নি ? যাকে তাকে সি আই এ'র এজেন্ট বলা, গালাগাল মন্দ করা, এসব ওদের ভুল হয় নি ? আমাদের যার যতটুকু সামর্থ তা আদায় করার চেষ্টা না করেই ওরা প্রথম থেকেই একটা গুপ্ত দলের মতন হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সংগঠনের কাজ না করে কি বিপ্লব হয় ? আমি যদি তখন ছাত্র থাকতুম, তা হলে আমিও নিশ্চয়ই হঠকারীর মতন ঐ সময় খুনের নেশায় মেতে উঠতুম। ছাত্র না হলেও, সেই সময় আমার মনে হতো, দেশজোড়া একটা বিপ্লব শুরু হলে আমি নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়বো। গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘেরার শ্লোগানটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ হতো

—আপনি বলুন তো, একটা পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হলে আমাদের এই দেশের কোনো উন্নতি সম্ভব ?

—সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই, ঝিল্লি। কিন্তু কারা সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে ? ঐ বলছিলুম, দুঃখ হতো, যখন দেখলুম, নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি, গ্রামে কয়েকটা জোতদার আর শহরে কয়েকটা কনস্টেবল হত্যা, ইস্কুল পোড়ানো আর মূর্তি ভাঙ্গা চলছে, তখন মনে হতো, সবকিছু পিছিয়ে যাচ্ছে, এতে প্রতিপক্ষই আরও

নিষ্ঠুর ও শক্তিশালী হবে।

—নীতীশদা আমার দাদাকে বলেছিলেন, শ্যামল, সেই যে তুমি একদিন শুধু পায়ের চটি দিয়ে একটা বিষাক্ত সাপকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেছিলে, সেই রকম প্রতিটি শ্রেণীশত্রুই ঐ বিষাক্ত সাপ, যে-কোনো অস্ত্র দিয়ে ওদের মারতে হবে।

—তোমার নীতীশদা নিজের হাতে কারুকে মেরেছিলেন কি?

—জানি না।

—তোমার দাদা কাকে মেরেছিল।

—সেন বাড়ির মেজোবাবুকে।

—তার ওপর খানিকটা ব্যক্তিগত রাগও ছিল।

—তা জানি না। লোকটা সত্যিই খারাপ। তখন আমার মনে হতো, সত্যিই এই সব মানুষদের খুন করা উচিত! আমাকে যদি কোনো অ্যাকশানে নিত, তা হলে আমিও বোধহয় সেই সময় খুন করতে পারতুম।

—এখন নিশ্চয়ই সেই সেনবাবুরই কোনো ছেলে সেই সব সম্পত্তির মালিক; একই রকম শোষণ বা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন?

—সেনবাবু নিজেই তো মরেন নি। সেই ঝিলের ধারে দাদা আর অনুদা সেনবাবুকে মোট তিনটে কোপ মেরেছিল, পেট থেকে নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায় উনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

—থাক, আর বলতে হবে না। কিন্তু নিজের গ্রামের মানুষকেই এভাবে খুন করার চেষ্টা, এতে তো ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই ছিল!

—সেটাই তো হয়েছিল দারুণ বোকামি। নীতীশদা আর আমাদের পূর্বস্থলীর বিজনদা মিলে এই পরামর্শ দিয়েছিল, আমরা অবশ্য তখন ভাবতুম, দু'এক মাসের মধ্যেই সারা দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে যাচ্ছে, সবাই আমাদের ভয়ে কাঁপবে।

—তারপর তোমার দাদা আত্মগোপন করলো?

—সেনবাবু দাদাকে চিনতে পেরেছিল। দাদা তো পালিয়ে রইলো, তারপর আমাদের ওপর কী অত্যাচার। একদিন সেনবাবুদের দলের তিরিশ চল্লিশ জন লোক আক্রমণ করলো আমাদের বাড়ি। নিশ্চয়ই

আগুন লাগিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মারতো, কিন্তু বেঁচে গেলাম আশ্চর্য-ভাবে। হঠাৎ পুলিশ এসে গেল। কেন পুলিশ এলো তা জানি না। পুলিশ তো ওদেরই দলের তাই না ?

—সত্যি আশ্চর্য বলতে হবে।

—পুরোপুরি বাঁচা গেল না অবশ্য। বাবার মৃত্যুর পর জ্যাঠামশাই আমাদের আলাদা করে দিয়েছিলেন। আমাদের ভাগের জমি জমা দেখবার কেউ নেই। শুধু জ্যাঠাইমার জন্যই আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়নি। এরই মধ্যে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর জ্যাঠামশাইকে এসে জানালো যে আমাকে গ্রাম থেকে কোথাও সরিয়ে দেওয়া উচিত। দাদাকে খুঁজে না পেলে ওরা আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। কথাটা আমারও সত্যি মনে হয়েছিল। আমি যেন টের পেতুম, অনেকগুলো হিংস্র চোখ আমার দিকে সব সময় লুকিয়ে চেয়ে আছে। ভয়ে আমি পুকুরঘাটে পর্যন্ত একা যেতুম না।

—কোথায় সরিয়ে দেওয়া হলো তোমাকে ?

—কোথায় আর যাবো ! আমাদের তো আর আত্মীয়স্বজন সেরকম কেউ নেই। মা চিঠি লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বরানগরে রাজাদাদের বাড়িতে।

—সেখানে রাজার সঙ্গে তোমার প্রেম হলো ?

মুখ তুলে বিষণ্ণ ভাবে হেসে ঝিল্লি বললো, লেখকদের কল্পনার সঙ্গে যদি মানুষের জীবন মিলে যেত, কতই না ভালো হতো। আপনি দীপ্তি নামের ঐ মেয়েটিকে নিয়ে উপন্যাস লিখলে এই রকম জায়গায় রাজার সঙ্গে তার প্রেম ঘটিয়ে দিতে পারতেন, তারপর ওরা বিয়ে করে সুখী হতো।

—আমার গল্পে নায়ক-নায়িকাদের বিয়েই হয় না। পাঠক পাঠিকা-দের অভিযোগ, আমার বেশীরভাগ উপন্যাসই অসম্পূর্ণ। সে যাই হোক। কিন্তু শুধু লেখকদের কল্পনায় কেন, বাস্তবেও তো কত ছেলে মেয়ের প্রেম হয় ! রাজার সঙ্গে তোমার তা হলো না কেন ?

—সময় যে শত্রুতা করেছে আমার সঙ্গে ! প্রেম নয়, তখন আমার বেঁচে থাকাটাই সমস্যা ছিল।

—রাজা ইতিমধ্যে অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে ?

—এটা আপনি ঠিক ধরেছেন। রাজাদা তখন তৈরি হচ্ছে বিলেত যাবার জন্য, একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়েও প্রায় ঠিক ঠাক। নীতীশদাও তখন পলাতক। রাজাদা আমাকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে খুব উৎসাহও দেখায়নি। সে বললো, তুমি কিনা আশ্রয় নিতে এলে বরানগরে ? এ জায়গাটা তো ওদের ডেন্। যে-কোনো দিন তোমার পরিচয় জেনে যাবে। খুব মিথ্যে বলেনি কিন্তু। একদিন ওদের বাড়ির দেয়ালে পোস্টার দেখা গেল, শ্যামল ঘোষালের মুণ্ডু চাই। রাজাদার বাবা ভয় পেয়ে আমায় বম্বে পাঠিয়ে দিলেন।

—তুমি একা এলে ?

—আর আমার সঙ্গে কে আসবে বলুন ? আমার ছোট ভাইটা চিররুগ্ন, আর মায়ের কাছেও তো একজনকে থাকতে হবে। তা ছাড়া আমি বম্বে তো এলুম এক বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে। রাজাদাদের আত্মীয়, আমাদের সঙ্গেও দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। তা হলেও, একটা মেয়েকে মাসের পর মাস কে আশ্রয় দিতে চায় বলুন ? সেখানে আমার অবস্থা প্রায় ঝি-এর মতন দাঁড়ালো।

—সে বাড়িতে কম বয়েসী কোনো ছেলে ছিল না ?

—কম বয়েসী কেন, বেশী বয়েসী পুরুষরা বুঝি মেয়েদের সম্পর্কে লোভ করে না ?

—সে রকম কিছু হয়েছিল ?

—যাঁকে আমি মামা বলে ডাকতুম, শ্রদ্ধা করতুম, একটা বড় কম্পানির ম্যানেজার তিনি, সেই তিনিই আমার প্রতি কু-দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কোনো মেয়ে যদি নিজে না চায়, তা হলে অন্য কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সেই জেদ নিয়ে ছিলুম বলেই তিনি আমায় নষ্ট করতে পারেন নি কোনোদিন। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর আমি বুঝলুম, এরকম ভাবে চললে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তখন আমি ভর্তি হয়ে গেলুম শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ রাইটিং-এর ছ'মাসের কোর্সে। রাত্তিরবেলা শুয়ে শুয়ে ইংরেজি বলা প্র্যাকটিস করতুম। আমার দাদার সঙ্গে মনে মনে কথা

বলতুম ইংরেজিতে। নিজের নামটা তো বোম্বাইতে এসেই পালটে নিয়েছিলুম

—তারপর তুমি চিমনলালের ওখানে চাকরি পেলে?

—ওটা আমার দ্বিতীয় চাকরি। প্রথমে আর একটা ছোট জায়গায় চাকরি পেয়েছিলুম। সেটা পেয়েই আমি চলে যাই ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে। এমন কি প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই বাড়িতে পাঠিয়েছিলুম একশো টাকা। চিমনলালের অফিসে চাকরি পাই পরীক্ষা দিয়ে। ফার্স্ট হয়েছিলুম। বোম্বাইতে একা একা থাকা, কত রকম প্রলোভন, কিন্তু সমস্ত রকম বিপদ এড়িয়ে চলতুম, ইচ্ছে ছিল, পশ্চিম বাংলার অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলেই ফিরে যাবো, আবার পড়াশুনো করবো—

—এখানে যে কত রকম ফাঁদ, সেটা তুমি জানতে না। ঐ চিমনলাল আর হরিশ চাওলা ফাঁদ পেতেছিল।

—ওরা যে আমায় কী খাইয়েছিল, তা আমি আজও জানি না। টেপ রেকর্ডারে সত্যি সত্যি আমার গলার আওয়াজ, ঐ সব কথা।

—নানা রকম ড্রাগ আছে, অস্বাভাবিক কিছু না। কিছু কিছু কথা ওরা সাজেস্ট করে নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে। সেই হরিশ চাওলা এখন কোথায়? এই বোম্বাইতেই আছে?

—কেন, সে থাকলে আপনি গিয়ে তার সঙ্গে মারামারি করতেন? আমার জন্য?

—খবরের কাগজে অন্তত এই সব লোকের কথা ফাঁস করে দেওয়া যেতে পারে।

—হরিশ চাওলা এখন প্যারিসে থাকে। বিরাট নাম। বছরে একবার আসে এখানে, আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব।

—বন্ধুত্ব?

ঝিল্লি বেশ জোরে হেসে উঠলো। লেখক একটু যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। এমন অপ্রত্যাশিত কথা তিনি আশাই করেন নি। তিনি আবার বললেন, সেই হরিশ চাওলা এখন তোমার বন্ধু?

—আপনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?

—হবো না ? সেই লোকটা সে তোমার বন্ধু হয়ে গেল ?

—তাই তো হয়। হয় না ? জীবন তো এই নিয়মেই চলে। আমি হরিশ চাওলার আবিষ্কার। ইওরোপ-আমেরিকার কাগজে আমার বুকের ছবি ছাপা হয়েছে।

—অর্থাৎ তুমি ওর কাছে আত্মসমর্পণ করলে ; ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলে ?

—আমার যা সম্পদ, তা আমি ব্যবহার করতে লাগলুম। কেউ কেউ বুদ্ধি বিক্রি করে, কেউ কেউ রূপ। সারা পৃথিবী ধরেই তো এরকম চলছে।

—যাই হোক। সেবার ফিরে গিয়ে তুমি তোমার দাদাকে কী দেখলে ?

—প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে প্লেন ধরেছিলুম। সেই আমার জীবনে প্রথম প্লেনে চড়া। বর্ধমানের একটা সাধারণ গ্রামের অতি সাধারণ মেয়ের কি প্লেনে ওঠার সৌভাগ্য হয় ? আমারও হয়নি। বুড়ি নামের সেই মেয়েটা প্লেনে ওঠেনি। উঠেছিল বোম্বাইয়ের ঝিল্লি রায়, তার কৌমার্যের দাম দিতে হয়েছে ঐ প্লেনের টিকিটের জন্য, আমার নগ্ন শরীরের ছবি জমা রাখতে হয়েছে একজনের কাছে। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ?

—শুনি ?

—ঐ ব্যাপারটা তো আমার অজান্তে, অনিচ্ছায় হয়েছিল। কিন্তু আমার দাদাকে বাঁচাবার জন্য যদি স্বেচ্ছায় আমাকে ঐ ভাবে টাকা রোজগার করতে হতো, তা হলে সে ব্যাপারটা কি দোষের হতো ? সেটার নাম কি পাপ ?

—রত্নাকর দস্যু তার বাবা মায়ের কাছে এরকমই একটা প্রশ্ন করেছিল। রামায়ণে অবশ্য এর উত্তরটা গোঁজামিল ধরনের দেওয়া আছে। কারণ দস্যু রত্নাকর ঋষি বাল্মীকি হয়ে ওঠার ফলে তাঁর বাবা মা না খেয়ে মারা গেলেন কি না, তা আমরা জানতে পারি না।

—রামায়ণ মহাভারতের কথা ছাড়ুন। আপনি নিজের মতটা বলুন।

—কোনো প্রিয়জনের জীবন বাচাবার জন্য অবধারিত হলে চুরি-ডাকাতিও আমি দোষের মনে করি না। মেয়েদের সতীত্বকেও আমি চরম পবিত্র কিছু মনে করি না। তবে, কেউ যদি জোর করে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও ফন্দি খাটিয়ে কোনো মেয়ের শরীর ভোগ করে, তবে সেটা আমার শুধু কুৎসিত না, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ মনে হয়। হরিশ চাওলা তো তোমার এখন বন্ধু, আর সেই চিমনলাল কোথায়? মেয়েদের কান্না দেখলে শুধু যার সেক্স জাগে? মানুষ যে এত অদ্ভুত হয়, তা আমি জানতুম না।

—লেখক মশাই, আপনারা শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালীদের নিয়ে লেখেন, তাদের মধ্যে বেশী বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু এদেশে কত রকম মানুষই যে আছে। চিমনলালের খবর আমি জানি না। আমার তো এখন আর প্রকাশ্যে কাঁদবার দরকার হয় না, তাই আমার সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ থাকবার কথা নয়। সে নিশ্চয়ই এখন অন্য ড্যামজেল ইন-ডিস্ট্রেস-এর সন্ধানে আছে। এ দেশে সে রকম মেয়ের তো অভাব নেই।

—এবার তোমার দাদার কথা বলো।

—হরিশ চাওলা কিংবা চিমনলালের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে তখন পারিনি, কারণ, দাদার কাছে যাবার বিশেষ দরকার ছিল। দাদাকে যে আমি কী ভালোই বাসতুম।

—তোমার দাদা কতদিন লুকিয়ে ছিল?

—প্রায় বছর খানেক। টাকা নেই, পয়সা নেই, কতদিন আর পালিয়ে থাকবে? সেই সময় ওদের দলের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা অনেকেই বিলেত আমেরিকায় পালিয়ে যায়। দাদার মতন গরীবদের তো সে উপায় নেই। পুলিশের হাতে ধরা দেওয়াও ছিল বিপজ্জনক··· ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলতো।

—জানি।

—সেনবাবুকে যে ভাবে ওরা মেরেছিল, ঠিক সেইভাবেই দাদাকে ওরা মারে। পেটটা কেটে নাড়ি ভুঁড়ি বার করে দিয়েছিল, তারপর মৃত ভেবে ফেলে চলে যায়। খুব কড়া জান বলেই দাদা তখনও বেঁচে

ছিল। কারা ধরাধরি করে ওকে আমাদের বাড়ির কাছে ফেলে গেছে। আমি যখন পৌঁছোলাম, তখন দাদা প্রায় শেষ অবস্থায় ধুঁকছে। মা-জ্যাঠাইমারা আশা ছেড়ে দিয়ে শুরু করেছেন কান্নাকাটি। নামমাত্র চিকিৎসা হয়েছে দাদার। আমি হাল ছাড়ি নি। সেই রাত্রেই পূর্বস্থলীর ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলুম, তিনি বললেন, এখানে কিছু করা যাবে না, কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা করা যেতে পারে। যে চিমনলাল আমায় আগের রাতে নষ্ট করেছে, তার দেওয়া টাকা কাজে লেগে গেল। ভোর বেলা বাণপুর থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে এনে দাদাকে নিয়ে রওনা হলুম কলকাতায়। সঙ্গে বনস্থলী থানার একজন কনস্টেবল। দাদার নামে তখনও পুলিশ কেস। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত দাদা পুলিশের আসামী। গাড়িতে দাদার মাথা আমি কোলে নিয়ে বসে আছি। এক একবার দাদার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আর তাতে আমারও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, আমি চেঁচিয়ে উঠছি, দাদা · দাদা

—তোমার বাড়ীর আর কেউ আসে নি ?

—কে আসবে ? জ্যাঠামশাই কিংবা তাঁর ছেলে নিজেদের এই ব্যাপারে জড়াতে চাননি। যদি তাঁদের ওপর কোপ পড়ে। অবশ্য কনস্টেবলটি সঙ্গে যাওয়ায় আমার উপকারই হয়েছিল—ওর সাহায্যে দাদাকে ভর্তি করতে পেরেছিলুম পুলিশ হাসপাতালে, অন্য কোনো হাসপাতালে জায়গা নেই। তাও দাদা কোনো বেড পায়নি, মেঝেতে। আমি দাদার পাশে রয়ে গেলুম, কেউ আপত্তি করলো না। অজ্ঞান অবস্থাতেই দাদার ঘন ঘন বমি হলে, আমিই সেই বমি পরিষ্কার করছি। ডাক্তার আসে না, নার্স আসে না, কী যে অবস্থা কল্পনা করা যায় না। আপনি ঐ সব হাসপাতাল দেখেছেন কখনো ?

—না।

—একবার দেখতে যাবেন। তা হলেই অনেকটা নরক দর্শন হয়ে যাবে। আমি ছুটে ছুটে গিয়ে যাকে পাই তাকে ধরে নিয়ে আসি। রাত আটটার সময় দাদার মুখ দিয়ে কী রকম অস্বাভাবিক শব্দ হতে লাগলো · পাশের কোয়ার্টারে ডাক্তারবাবু তখন কোথায় যেন নেমন্তন্ন খাবার জন্য

বেরুচ্ছিলেন, আমি হিড় হিড় করে টেনে আনলুম তাঁকে। তিনি আমায় ধমক দিয়ে বললেন, আমি কী করবো? শেষ অবস্থায় নিয়ে এসেছেন··· একে রক্ত দিতে হবে, সেই কথা তো টিকিটে লেখাই আছে, রক্ত জোগাড় করেননি কেন? কোথা থেকে রক্ত জোগাড় করবো? ব্লাড ব্যাঙ্কে ফোন করে জানা গেল রক্ত নেই। তখন তো রক্ত ঝরাবার দিন, রক্ত দান করার দিন তো নয়। কলকাতায় নাকি রক্তও ব্ল্যাক হয়, কোথায় কোথায় বেশী দামে পাওয়া যায়, কিন্তু আমি একা মেয়ে, কলকাতার কিছুই চিনি না।

—রাজার সাহায্য চাইতে পারোনি? তার বাবা ডাক্তার।

—রাজাদা তখন বিলেতে···বরানগরে ওদের বাড়িতে অতদূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, গেলেও সাহায্য পেতুম কিনা জানি না। ডাক্তারবাবুকে বলেছিলুম আমার রক্ত নিতে, উনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে আমার সঙ্গে গ্রুপে মেলে না। আমার তখন পাগলের মতন অবস্থা। আমি সেই ডাক্তারটিকে বললুম, তাহলে আপনি রক্ত দিন। আপনার ব্লাড গ্রুপ কী আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কথাটা বলে আমি একেবারে বাঘের মতন তাকিয়ে ছিলাম ওঁর দিকে, উনি না বললে আমি ওঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ে কামড়ে দিতুম।

—উনি দিলেন রক্ত?

—সেই জন্যই তো মানুষের ওপর এখনো বিশ্বাস হারানো যায় না। সেই ডাক্তারটির নাম আমি জীবনে ভুলবো না, ডাঃ পি সি বিশ্বাস, পরে এক সময় আমি গোপনে ওঁকে একটা হাত ঘড়ি পাঠিয়েছিলাম। উনি শুধু যে নিজের রক্ত দিয়েছেন তাই না, সারা রাত জেগে···মানে উনিই দাদাকে বাঁচিয়ে তুললেন। অন্য সবারই ধারণা ছিল, এটা একটা অসাধ্য কাজ। অথচ সেই ডাক্তারটি এর জন্য আমার কাছ থেকে কোনো প্রতিদান চান নি।

একটুক্ষণ ঝিল্লি চুপ করে রইলো। লেখকও নিঃশব্দে টানতে লাগলেন সিগারেট। এই রকম ট্রাজেডির কথা তিনি আগেও কিছু শুনেছেন, জানেন। কত সুন্দর তরুণ তাজা প্রাণ নষ্ট হয়েছে অকালে, সেই তুলনায় বদমাস, পাষণ্ডরা নিহত হয়েছে ক'জনই বা। বেশীরভাগ

খুনোখুনিই তো অন্তর্কলহে। তিনি জানেন, সেই সময়কার কিছু আদর্শবাদী এখন মাথার গোলমালে ভুগছেন। এইসব কথা ভাবলেই তাঁর মন ভার হয়ে যায়, যেন নিজেরই একটি স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে।

ঘোর ভেঙে ঝিল্লি বললো, আপনি আর একটু নিন। বোতলে তো আরও একটু আছে।

লেখক বাকি কামপারিটুকু খানিকটা ঝিল্লির গেলাসে, খানিকটা নিজের গেলাসে ঢেলে নিলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তারপর পনেরো দিন বাদে বোম্বেতে ফিরে এলে?

—না এলেও পারতুম, তাই না? চিমনলাল তো ঐ টাকাটা ফেরৎ পাবার আশায় আমায় দেয়নি। আমি না ফিরলে সে কিছুই করতো না। তবু আমি ফিরেছিলুম, পনেরো দিন বাদে নয়, দেড় মাস বাদে। কেন ফিরেছিলুম, বলুন তো?

—এটা কোনো ধাঁধা নয়। অভাবের টানে।

—ঠিক তাই। দাদা একটু সেরে উঠবার পরই ওকে মিসা করে জেলে ভরে দিল। এদিকে দারিদ্র্য হাঁ করে আছে আমাদের সংসারে। এক সময় আমার বাবা টাকা পাঠাতেন বাইরে থেকে, আমি কয়েক মাস বম্বে থেকে টাকা পাঠিয়েছি। বাইরের টাকা ছাড়া আমাদের সংসার চলবার কোনো উপায় নেই। এমন কি আমার মা পর্যন্ত চাইছিলেন আমি আবার বম্বে ফিরে যাই।

—এবার চিমনলাল কী রকম ব্যবহার করলো?

—কিচ্ছু না। অফিসে ঢুকেই জানতে পারলুম, সেখানে আমার চাকরি নেই। চিমনলাল আসলে আমার ছুটি স্যাংসান করে নি। এক হাজার টাকা আর প্লেনের টিকিট এমনিই দিয়েছিল। সেই সময় চিমনলাল দিল্লিতে, সুতরাং দেখাও হলো না।

—বোম্বেতে এসে কোথায় উঠলে?

—সেই হস্টেলেই। সেখানে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল, কিছুদিন রইলুম তার গেস্ট হয়ে। প্রাণপণে চাকরি খুঁজি। কিন্তু তখন খুব দরকার তো, সেই জন্যই পাওয়া যায়

না। শুধু আমার নিজের জন্য নয়, বাড়িতে মা আর ছোট ভাইটার জন্য টাকা পাঠাতে হবে। ঐ হস্টেলের কয়েকটি মেয়ে সন্ধ্যেবেলা অন্যভাবে টাকা রোজগার করে, বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কেউ কেউ আমাকে সেই পথ ধরবার ইঙ্গিত দিল। একজন জিজ্ঞেস করলো, আমি কোনো আর্টিস্টের ছবি আঁকার মডেল হতে রাজি আছি কিনা। সব জামা কাপড় খুলতে হবে না। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা ম্যাগাজিনের কভারে দেখলুম আমার ছবি। মুখের ওপরে চুলগুলো ফেলা, এক সাইড থেকে নেওয়া, অন্য কেউ চিনতে পারবে না চট করে, কিন্তু আমি তো ঠিকই চিনবো নিজেকে। হরিশ চাওলার তোলা। ছবিটা দেখে প্রথমেই কী মনে হলো বলুন তো? রাগ, না লজ্জা, না ঘেন্না?

—তিনটেই একসঙ্গে।

—কোনোটাই না। লোভ। তখন আমার হাতে ঠিক তিনটে টাকা আছে। বোম্বের মতন এত বড় শহরে টাকা না থাকলে যে নিঃস্ব লাগে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পয়সা খরচ হয় বেশি। বাড়ির বাইরে বেরুতে গেলে মেয়েদের খানিকটা সাজগোজ করতেই হয়। একটু ভালো শাড়ী পরতে হয়। সাজগোজ না করলে কেউ পাত্তাই দেবে না। আমি তো তেমন সুন্দরী নই। চাকরি খোঁজার জন্যও মেয়েদের সেজেগুজে বেরুতে হয়।··· ছবিটা দেখে মনে পড়লো, ছবি ছাপা হলে হরিশ চাওলা টাকা দেবে বলেছিল। কত টাকা তা জানি না। তবু কিছু তো পাওয়া যাবে। সোজা চলে গেলুম ওর কাছে। ঝগড়া করতে হলো না। আমাকে দেখেই বললো, নিশ্চয়ই, তোমার টাকা রেডি আছে। এই নাও, দুশো টাকা। মনে রেখো, প্রথম কাজের জন্য অনেক মেয়েই পঁচিশ টাকাও পায় না। সেই টাকা থেকে মাকে পাঠিয়ে দিলুম একশো টাকা।

—তারপরই হরিশের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল?

—প্রথম দু'বছর তো হরিশই আমায় বাঁচিয়েছে। অন্য দু'একটা জায়গায় এই মডেলিং-এর কাজ নেবারও চেষ্টা করেছিলুম। তখন অন্যরা বলতো, আমার চোখ দুটো ছোট, নাকটা বোঁচা, আমার মুখখানা ঠিক ফটোজিনিক নয়। তারা আরও বলতো, আমরা তো আর হরিশের

মতন ন্যুড বেচে খাই না। কিন্তু হরিশের জন্য আমার নাম হয়েছে, ডিমাণ্ড অনেক বেড়েছে। আমি আমার রেট ডিকটেট করি। প্লে বয় ম্যাগাজিনে একবার একটা 'ব্ল্যাক বিউটি' সংখ্যা বেরিয়েছিল, আপনি দেখেছিলেন ?

—প্লে বয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয় না।

—আপনাদের কলকাতার দিকে বেশী চল নেই, কিন্তু বম্বেতে খুব চলে। বাড়িতে প্লে বয় রাখা খুব ফ্যাস্‌নেব্‌ল ব্যাপার। অনেকেই ফরেন থেকে নিয়ে আসে। সেই ব্ল্যাক বিউটি নাম্বারে আমার তিনটে ছবি ছাপা হয়েছিল। পেয়েছিলুম সাড়ে সাত হাজার টাকা। জানি আপনার মনে এখন কী কথাটা ঘুরছে।

—কী বলো তো। তুমি মনের কথাও বুঝতে পারো নাকি ?

—আপনি ভাবছেন, আমি এই জীবনটাই বেছে নিলুম কেন। কিন্তু একবার যার ন্যুড ছবি ছাপা হয়েছে, তার পক্ষে আর কেরানী বা টাইপিস্টের চাকরি করা সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ এটা মেনে নেয় না।

—আর যাই হোক, একথাটা কিন্তু আমি ভাবছিলুম না।

—আমার মুখটা সুন্দর নয় বলে ফটোগ্রাফাররা আমার মুখটা ব্যবহার করে খুব কম। তাও আমার ভুরু নেই, মাথার চুল কাটা, আমার চুলের ডিজাইন, চোখের ভাব বদলানো যায়। চোখের পাতাও বড় করা যায়। আমি সাবধান থাকি, যাতে আমাকে চেনা না যায়। তবু বোম্বের বেশ কিছু বাঙালী আমার কথা জেনে গেছে। ওদের অনেকে আমার সঙ্গে একা একা দেখা করতে চায়। কিন্তু কোনো ফাংশানে আমার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলে না, ঘেন্নার ভাব দেখায়।

—তোমার বাড়ির লোক কেউ জানতে পারেনি ?

—অনেকদিন পর্যন্ত সেই চিন্তাটা আমায় কুরে কুরে খেয়েছে। জানতে পারলে মা কষ্ট পাবে। কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও তো তখন ছিল না। আমি টাকা না পাঠালে আমার মা আর ছোট ভাই না খেতে পেয়েই মারা যাবে। জ্যাঠামশাই তখন আমাদের জমিজমা হাত করে নিয়েছিলেন, জ্যাঠাইমা অন্ধ, তিনি কিছু করতে পারতেন না···দাদার

সঙ্গে জেলে একবার দেখা করতে গিয়েছিলুম, দাদা বলেছিল, বুড়ি, তুই দেখিস মায়ের যেন কষ্ট না হয়···দাদা তখন জানতে চায় নি আমি কী ভাবে টাকা রোজগার করি··· আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাই, এখন এক হাজার টাকা করে পাঠাই। আমার দাদা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে অনেকদিন, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হয় নি, এখনো পার্টি করে। রোজগার যৎসামান্য।

—ঝিল্লি, একটা অনুরোধ করবো?

—বলুন।

—তোমার জীবনের কথা শুনতে শুনতে একটা দারুণ কৌতূহল হচ্ছে। সেইজন্য কথাটা বলেই ফেলি। তোমার বুক, যা নাকি অত্যাশ্চর্য, এক মিলিয়ানে একটা মেয়ের নাকি দেখা যায়, সেটা নিজের চোখে না দেখলে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। একবার দেখাবে?

—দেখবেন?

ঝিল্লি উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। তারপর হাতে নিয়ে এলো এক গাদা ম্যাগাজিন। সেগুলো আমার সামনে রেখে বললো, দেখুন। আপনি নিশ্চয়ই আগেই আমার ছবি দেখেছেন কোথাও না কোথাও। না দেখে উপায় নেই।

পত্রিকাগুলো উল্‌টে দেখতে লাগলেন লেখক। অনেক বিজ্ঞাপনেই আছে ঝিল্লির ছবি। ব্রা, প্যান্টি, পাউডার, সাবান। কয়েকটি পত্রিকার মলাটেও ওর ছবি, সেগুলি বিজ্ঞাপন নয়, আকর্ষণীয় নারী শরীর। মুখ দেখলে সত্যি চেনা যায় না।

পত্রিকাগুলো সরিয়ে রেখে লেখক বললেন, হ্যাঁ, ছবিগুলো বেশ ভালো নিশ্চয়ই। কিন্তু বুক সম্পর্কে বিশেষত্ব ঠিক বোঝা গেল না।

ঝিল্লি বললো, প্লে বয় ম্যাগাজিনটা দেখবেন? সেগুলো কিন্তু একদম ন্যুড।

—না থাক। মানে, ছবিতে নয়, তোমার রক্ত মাংসের বুক একবার চোখে দেখা যায় না?

—না দেখাই ভালো। তবে আপনি বলছেন যখন···দেখাতে পারি। দূর থেকে।

—দূর থেকে কেন ?

—কাছ থেকে দেখলে যদি আপনি ছুঁয়ে দেখতে চান !

—ছুঁয়ে দেখতে চাইলে সেটা খুব দোষের হবে ?

—আমার এমনিতে তেমন লজ্জা থাকবার কথা নয়। অনেকের সামনেই বুকের জামা খুলতে হয়েছে। কিন্তু আপনি ছুঁতে চাইলে আমি খুবই মুস্কিলে পড়বো।

—শুধু আমি ছুঁতে চাইলে ?

হ্যাঁ। কারণ, আপনি তো রক্ত মাংসের মানুষ নন। আপনি একজন লেখক। আপনি আমার স্বপ্নের মানুষ ! আপনার সঙ্গে তো এর আগেও কতদিন মনে মনে কথা বলেছি। এক হিসেবে আপনি আমার অলটার ইগো। সেই জন্যই তো আপনার কাছে এত কথা বলতে পারছি। অন্য কারুর কাছে কি বলি ? কোনোদিনই তো বলিনি।

জানলার কাছে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঝিল্লি প্রথমে মাথার ওপরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বেলে দিল, তারপর নিঃসঙ্কোচে আঁচল ফেলে, ব্লাউজ ও ব্রা খুলে ফেললো।

লেখক একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার দু'চোখ ভরা বিস্ময়। এ রকম বাতাবী লেবুর মতন শক্ত, গোল স্তন তিনি কখনো দেখেননি আগে। হরিশ চাওলা উপমাটা ঠিক দিয়েছিল। কুমোররা মাটি দিয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতীর যে মূর্তি গড়ে; তাদের বুক এই রকম। কোনারকের সুরসুন্দরীর স্তন দুটিও অনেকটা এই জাতেরই। রক্ত-মাংসের কোনো নারীর এরকম হয় !

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লেখকরা রক্ত-মাংসের মানুষ হয় না ? কিন্তু আমার হতে ইচ্ছে করে খুব।

—না। আমার কাছে, আপনি তা হতে পারবেন না। আপনাকে এখন যা দেখালুম, এতক্ষণ তার চেয়ে অনেক বেশী দেখিয়েছি, অন্য কেউ যা দেখে না। আমার হৃদয় খুলে দেখিয়েছি আপনার কাছে।

—হরিশ চাওলা ঠিকই বলেছে, তোমার বুক অসাধারণ।

—এই বুক দিয়ে আমি আমার দাদার চিকিৎসা করেছি, এখনো আমাদের সংসার চালাচ্ছি।

—ঝিল্লি, তোমার মনের জোরও অসাধারণ। সাধারণ একটা গ্রাম থেকে আসা বাঙালী মেয়ে, বোম্বাইয়ের মতন শহরে একা একা লড়ে যাচ্ছো—

—কতখানি লড়াই করতে হয়, তা তো আপনি এখনো সব জানেন না। এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা আপনারা করে রেখেছেন, যাতে কোনো মেয়ে একা থাকলেই পুরুষরা তাকে শুধু বিছানায় টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

—তোমাকে কি অনেকের সঙ্গে বিছানায় যেতে হয়েছে?

—আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, এ পর্যন্ত শুধু একজনের সঙ্গেই আমার শারীরিক মিলন হয়েছে। প্রথমবারের সেই ঘটনাটা বাদ দিয়ে অবশ্য।

—কে সেই মহা ভাগ্যবান? হরিশ?

—না। হরিশ তার কথা রেখেছিল। সে আমাকে কোনোদিনও ঐভাবে চায় নি। আমি একজনকে ভালোবাসি। তার নাম কৃষ্ণ। এখানকার উচ্চারণে কৃষ্ণা। সে একজন আর্টিস্ট, এই ঘরের দেয়ালের ছবিগুলো তার আঁকা। খুব যে ভালো আর্টিস্ট তা নয়, কিন্তু মানুষটা একদম পাগল। ও আমাকে টাকা পয়সা দেয় না কিন্তু, আমার কাছ থেকেই টাকা নিয়ে যায়···একটা অদ্ভুত স্বপ্নমাখা লোক, একেবারে বিন্দাস্ যাকে বলে, ওকে ভালো না বেসে পারা যায় না। কেরালায় ওর বউ আছে, তার সঙ্গে ওর মনের মিল নেই।

—ঝিল্লি, তুমি এই জীবনে সুখী?

—কী জানি! তবে কি জানেন, এক একজনের মনের গড়ন তো এক এক রকম হয়। আমি চেয়েছিলাম লেখাপড়া শিখবো, সমাজে যাকে বড় বলে সেই রকম বড় হবো, মা, দাদা, ভাই, জ্যাঠাইমা এদের স্নেহ নিয়ে এদের কাছাকাছি থাকবো।

—ওদের কাছে ফিরে যাওয়া যায় না?

ঝিল্লি উত্তর না দিয়ে হাসলো। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। আপনাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় নি। সসেজ খাবেন, ভেজে দেবো?

—না। এবার আমি উঠবো। আর বেশীক্ষণ থাকলে যদি আমি

রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে যাই। একটা শুধু শেষ প্রশ্ন। সেই রাজা, তার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয় নি?

—হয়েছে। একবার, খুব নাটকীয় ভাবে।

—কোথায়? এই বোম্বেতেই?

—আপনি যে সোফাটায় বসে আছেন, ওখানেই সে বসেছিল। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, একটা কাজের জন্য বাঙ্গালোরে একটা স্টুডিওতে আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। একদিন এয়ারপোর্টে হঠাৎ রাজাদার সঙ্গে দেখা। সে এখন বিলেত ফেরত ডাক্তার। এখানে কী একটা কনফারেন্সে এসেছিল। প্রথমে আমায় চিনতে পারে নি, আমার পোষাক একটু অদ্ভুত ছিল, আমিই চিনলুম আর ডাকলুম।

—দেখা মাত্র বুক কেঁপেছিল?

—ঠিক ধরেছেন। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল। ঠিকানা দিলুম, রাজাদা ঠিক খুঁজে খুঁজে এলো এখানে। প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি একা থাকো? তারপর···তারপর আর কী বলবো আপনাকে, বলতে গেলে কান্না পেয়ে যায়, আমি একা থাকি একটি যুবতী মেয়ে···অমনি আমি রাজাদার চোখে একটা খাদ্য হয়ে গেলুম। ভুলে গেল আমার ছেলেবেলার কথা। আমার দুঃখের কথা কিছুই জানতে চাইলো না, আমায় বিছানায় নিয়ে গিয়ে রাজাদা আমার শরীরটা খেতে চাইলো।

—তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল?

—একেবারে কিছুই দিই নি ওকে। দরজা খুলে লিফটম্যানকে ডেকে বলেছিলুম ঐ অসভ্য লোকটাকে বার করে দিতে। মুখ নিচু করে চলে গেল। যে আমার সমস্ত হৃদয় পেতে পারতো সে এসেছিল শুধু লোভীর মতন শরীরের একটুখানি নিতে। রাজাদাকে ঘিরে আমার যে একটা স্বপ্ন ছিল, সেটাও আর নেই, এই জন্যই আমার বেশী কষ্ট।

হঠাৎ চুপ করে গেল ঝিল্লি। দেয়ালে পিঠ দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, পাশে কাচের জানালা, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে শহরের আলোকমালা। এখনো বুক আঁচলে ঢাকে নি ঝিল্লি, নগ্ন বুকের ওপর একটা হাত রাখা, চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল।

লেখকও তার চোখে চোখ রেখে নীরব রইলেন।

একটু পরে ঝিল্লি আস্তে আস্তে বললো, আপনি আমার বুক ছুঁতে চেয়েছিলেন, কেন আমি রাজি হইনি জানেন? আপনি লেখক, আপনি ছুঁয়ে দেখলে ঠিকই বুঝতে পারতেন, আমার এই বুক রক্ত-মাংসের নয়। আমার বুক পাথরের তৈরি!

সেই মুহূর্তে লেখকেরও যেন মনে হলো ঝিল্লি রায়কে তিনি একটি ভাস্কর্যের মতন দেখছেন। কিন্তু সেই ভাস্কর্যের দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে।

প্রস্থানপর্ব

গগনই চ্যাঁচামেচি করেছে সবচেয়ে বেশী। দু'বছর আগেকার একটা পুরোনো পত্রিকা দীপ্তির সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, এটা কী? লোকে আমাদের বলে, তোমার বোন বেশ্যা?

বোম্বাইয়ের একটা সস্তা ইংরেজি পত্রিকা, বাংলার এই গ্রামেও এসে পৌঁচেছে? মাস মিডিয়ার উদ্দেশ্যই তো একেবারে সর্বস্তরে পেনিট্রেট করা।

ছবিটা যে দীপ্তিরই তা জোর করে বলার উপায় নেই। মুখের অনেকখানিই চুলে ঢাকা। অথচ দীপ্তি অস্বীকারও করতে পারে না। ছবিটা সত্যিই তার। সে ছবির শরীরে কোনো পোষাক নেই।

বন্ধুদের কাছে বকু খবর পেয়েছিল যে তাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা রিক্সা চেপে কে একজন হেভী সাজগোজ করা মেয়েছেলে এসেছে। তখনই ভয় পেয়েছিল বকু। বোম্বে থেকে তার দিদি এসেছে নিশ্চয়ই। দিদি সম্পর্কে বন্ধুরা খারাপ কথা বলে।

শ্যামল শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরলো পরের দিন সকালে। এই বয়েসেই সে দারুণ হাঁপানীতে ভোগে। শরীরে জোর নেই, কিন্তু মনের তেজ একটুও কমে নি।

শ্যামলের স্ত্রী প্রায়ই যে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকছে, তার কারণও তো এই। শ্যামলের বোন সম্পর্কে খারাপ কথা রটে গেছে। তাদের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার। এরকম ব্যাপার তারা কল্পনাই করতে পারে না।

শ্যামল তার বোনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, তুই আমাদের এতদূর অপমান করলি, বুড়ি? মুনাফাবাজ বানিয়াগোষ্ঠীর শিকার হয়ে সেই টাকায় আমাদের খাওয়ালি? এর চেয়ে যদি আমরা আধপেটা খেয়ে থাকতুম, কিংবা না খেয়ে মরতুম, তাও ভালো ছিল। ঐ পাপের টাকা···

দাদার মুখে মুখে এখনও তর্ক করতে পারে না দীপ্তি। সে চুপ করে রইলো।

শ্যামল আবার বললো, সারা দেশ জোড়া একটা চক্রান্ত চলছে, অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে যুব সমাজের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করছে, আমার নিজের বোন কিনা তার একটা যন্ত্র? সেই অন্যায়ের টাকা আসে আমাদের বাড়িতে!

গত মাসেও দীপ্তির পাঠানো টাকা এ বাড়ির কেউ সই করে নিয়েছে। একবারও সে টাকা ফেরৎ যায় নি।

দীপ্তির বুকে কান্না ঠেলে আসছে। সে মৃদু গলায় বললো, দাদা, আমি যদি এখন সব ছেড়ে দিই? তোদের কাছে এসে আবার থাকি?

—এখানে? এ গ্রামে তোকে আর কেউ টিঁকতে দেবে? কারুর জানতে বাকি নেই। তোর বৌদির বাড়ির লোকেরা বিশ্রী কথা বলাবলি করছে, শুনলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

—শুধু বৌদির বাড়ির লোক নিন্দে করছে বলেই তোরা আমায় ত্যাগ করবি?

—শুধু ওরা কেন, এ তল্লাটের সবাই জানে!

—এ বাড়িতে আমার আর জায়গা নেই?

—এর চেয়ে তুই মরলি না কেন? আত্মসম্মান বিক্রি করার চেয়ে মরাও অনেক ভালো।

—মরতে আমার ইচ্ছে করে না। কার ইচ্ছে করে? দাদা, আমি এর মধ্যে বি. এ. পাশ করেছি, ফ্রেঞ্চ আর রাশিয়ান ভাষা জানি। কলকাতায় যদি একটা চাকরি নিয়ে থাকি?

—বোম্বাইতে এ-সব কীর্তি করেও তোর যথেষ্ট হয়নি। এবার আরও কাছে এসে তুই সবার মুখ ডোবাবি! তোর ঐ পরিচয় জানলে

তোকে কে চাকরি দেবে !

রাত্তিরবেলা মমতাও বললেন, তুই এলি কেন? এতদিন যখন আসিস নি, তবে এখন এলি কেন? আমরা তবু বলতে পারতুম, ওর সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখন থেকে তোর টাকাও আমরা চাই না।

পুকুরঘাটে যাবার পথে দীপ্তি জ্যাঠাইমার হাত ধরে বললো, বড়মা, তোমাকে সত্যি কথা বলবো বলেছিলাম, তুমি শুনবে?

— ছবি দেখিয়ে তোর নামে ওরা খারাপ কথা কেন বলে রে? কী আছে ছবিতে? আমি তো চোখে দেখি না।

—বড়মা, তখন আমার আঠারো বছর বয়েস। তোমরা আমাকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলে। বোম্বাইয়ের মতন এক অচেনা শহরে আমি পড়লুম, একা, কোনো সহায় সম্বল নেই। সুন্দর বনের জঙ্গলে একটা বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে কী রকম হয়, বাঘ ভাল্লুকে ছিঁড়ে খায় না?

—আহা রে!

—বড়মা, আমি জেনে শুনে কোনো পাপ করিনি। তখন দাদা জেলে, আমাদের বড় অভাব, বোম্বাইতে কোনো রোজগার নেই, তখন কিছু লোক আমাব ছবি তুলে বিক্কিরি করতে চাইলো।

— ছবি বিক্কিরি?

— হ্যাঁ। এমনি ছবি নয়। জামা-কাপড় খোলা ছবি। বড়মা, না খেয়ে মরার চেয়ে সেরকম ছবি তুলতে দেওয়া কি পাপ? তুমি বলো?

— আহা রে! বোম্বাইতে কত কষ্টই না জানি তোকে সইতে হয়েছে! কেন, আমার কাছে চলে এলে আমি কি তোকে খেতে দিতুম না?

—তুমি আর এতগুলো লোককে কতদিন খাওয়াবে? বড়মা, ওরা বলে, আমার বুক নাকি অন্যরকম। তুমি হাত দিয়ে ছাখো। দেখেছো, খুব শক্ত না? আমার বুক এত শক্ত কেন জানো? নইলে কোন্‌দিন যে হঠাৎ ফেটে যেতো। বড়মা, আমিও যে আর সইতে পারছি না!

দীপ্তির মাথায় হাত দিয়ে সেই অন্ধ বৃদ্ধা ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলেন, ওরে, কাঁদিস না। না, না, তোর কোনো পাপ হয় নি, মায়ের জন্য ভাই-বোনের জন্য যা করেছিস বেশ করেছিস! ছবি যে যাই তুলুক,

আমি তো জানি, তুই আমাদের সেই বুড়ি, কত ভালো মেয়ে···

জ্যাঠামশাইয়ের জন্য ধুতি, ভাইদের জন্য প্যাণ্ট আর সার্টের কাপড়, অন্যদের জন্য শাড়ী এনেছে দীপ্তি। কেউ কিছু নেবে না। ঘোষালবাড়ির মানুষদের আর কিছু না থাকুক মর্যাদাবোধ আছে। কোনো নষ্ট মেয়ের দেওয়া জিনিস তারা নিতে পারে না।

এখানে থাকা হবে না দীপ্তির। পরের দিনই চলে যেতে হবে।

শুধু একবার সে জ্বলে উঠবে ভেবেছিল। তার টাকা আছে, ইচ্ছে করলেই সে কলকাতা কিংবা বর্ধমান শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারে। আত্মীয়-স্বজনরা অস্বীকার করলে তার ভারি বয়েই গেল। সে স্বাধীনভাবে একা থাকলে তাকে কে আটকাবে?

কিন্তু ক'দিন? এবং তারপর?

বিদায় নেবার সময় সে শ্যামলকে বললো, দাদা, আমি যদি মরে যেতে না চাই, তা হলে আমার কি ফেরার অন্য কোনো পথ নেই? আমি যদি সন্ন্যাসিনী হই?

শ্যামল বলল, আমি জানি না!

—যদি রাস্তায় ভিক্ষে করি? তাতে আমার পাপ কাটবে?

—তোর যা খুশী করতে পারিস।

—যদি বস্তিতে গিয়ে গরিবদের সেবা করি?

—বলছি তো, তোর যা খুশী করতে পারিস।

—যা খুশী করতে পারি, কিন্তু এখানে নয়, তোদের চোখের আড়ালে, তাই না? কিন্তু আমি ওসব কিছুই করবো না। আমি আমার শরীরের ছবিই বিক্রি করবো। তাতে আমার আত্মা বিক্রি হয় না।

রিক্সায় ওঠার আগে দীপ্তি তার ক্যামেরাটা বার করলো। তাদের বাড়িটার কয়েকটা ছবি তুলবে। লেন্সের মধ্যে দিয়ে দেখতে লাগলো তাদের বাড়ির উঠোন, তুলসীমঞ্চ, মা, দাদা······। এখন থেকে তার সব কিছুই শুধু ছবি হয়ে থাকবে।

পরমেশ প্রথমে যেতে রাজি হননি। সভা-সমিতিতে তিনি 'যেতে চান না আজকাল, সবাইকে নানান ছুতোয় ফিরিয়ে দেন। শুধু শুধু সময় নষ্ট। সভার উদ্যোক্তারা যতখানি আগ্রহ কিংবা খাতির-যত্ন করে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে দেবার সময় আর সে-রকমটি থাকে না। উদ্যোক্তাদের অনেকের পাত্তাই পাওয়া যায় না সে সময়। এমনও হয়েছে, কোন সভা থেকে ফেরবার সময় পরমেশকে একলাই রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজে নিতে হয়েছে।

কিন্তু এই ছেলেদুটি খুবই জোরাজুরি করতে লাগলো। পরমেশের এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছে এরা। দুজনে স্বাস্থ্যবান গ্রাম্য যুবক, কথাবার্তার মধ্যে ওপর চালাকির ভাব নেই, বেশ বিনীত।

পরমেশ বললেন, কী করে যাব, আমার যে নানা কাজ! এখন আমার বাইরে যাবার কোন উপায় নেই। তোমরা অন্য কারুকে নিয়ে যাও না!

ছেলেদুটি তবু বার বার বলতে লাগলো, না, স্যার, আপনাকে যেতেই হবে! আপনার কথা বিশেষ করে বলে দিয়েছে আমাদের কমিটি!

পরমেশ তখন একটু রেগে উঠে বললেন, বিশেষ করে বলেছে বলেই আমায় যেতে হবে? কোন গায়ক কিংবা ফিল্ম স্টারকে নিয়ে গেলে তো তোমরা এক গাদা টাকা দাও! আর কোন সাহিত্যিককে নিতে হলে টাকার কথা চিন্তাও করো না। সাহিত্যিকদের সময়ের কোন দাম নেই, তাই না?

যদিও মনে মনে এই রকম একটা ক্ষোভ ছিল অনেকদিন থেকেই, কিন্তু টাকার কথাটা এ রকম ভাবে তিনি আগে কখনো উচ্চারণ করেননি। সাহিত্যিকদের মুখে টাকা-পয়সার কথা যেন ঠিক মানায় না। হঠাৎ বলে ফেলে তিনি বেশ লজ্জা পেয়ে গেলেন।

ছেলে দুটি একটু থতমত খেয়ে আমতা-আমতা ভাবে বলল, না স্যার, আমাদের গ্রামে কোন গায়ক বা ফিল্ম স্টার কখনো যায়নি। আমাদের

ছোট গ্রাম, বিশেষ কেউ যেতে চায় না। আমাদের স্কুলটার পঁচিশ বছর হল, সেই জন্য আপনাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমাদের গ্রামে গেলে কিন্তু আপনার খারাপ লাগতো না, বেশ নিরিবিলি সুন্দর জায়গা।

পরমেশ ঐ টাকার কথা তুলে বকুনি দিয়েছেন বলেই এখন অনুতপ্ত স্বরে বললেন, কত দূরে তোমাদের গ্রাম?

একটু দূর আছে, স্যার। আরামবাগ ছাড়িয়ে আরও এগারো মাইল। আমাদের স্কুল কমিটির টাকা বেশি নেই, তবু আপনাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাব—

পরমেশ বললেন, ট্যাক্সির কি দরকার, বাস যায় না?

অনেকদিন কোন গ্রামে যাওয়া হয়নি, সেই ভেবেই পরমেশ ঠিক করলেন, তা হলে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। অবশ্য গ্রাম সম্পর্কে তাঁর সে-রকম কিছু মোহ নেই। টাটকা মাছ কিংবা স্বাস্থ্যবান তরিতরকারি আজকাল শহরেই ভাল পাওয়া যায়। গ্রামের যা কিছু সেরা জিনিস তা শহরে চলে আসবেই! অবশ্য টাটকা বাতাস এখনো গ্রামেই পাওয়া যায় বোধহয়, শহরে অনেক পয়সা খরচ করলেও সেটা পাবার উপায় নেই।

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের গ্রামে নিশ্চয়ই ডাক বাংলো নেই। থাকবো কোথায়?

আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে থাকবেন। তিনি বলে দিয়েছেন, আপনার আতিথ্যের কোন ত্রুটি হবে না। বেশ বড় বাড়ি। আপনি যদি সঙ্গে কারুকে নিয়ে যেতে চান, তাতেও কোন অসুবিধে নেই।

বছরে দু'চারবার অন্তত সভাসমিতির জন্য পরমেশকে বাইরে যেতেই হয়। তবে সব সময়েই তিনি আলাদা কোন জায়গায় থাকতে চান। কারুর বাড়িতে উঠলে অতিরিক্ত খাতির যত্নের ঠ্যালায় প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়! তাছাড়া প্রত্যেক বাড়িতেই একটা আলাদা নিয়ম-কানুন থাকে। সেই সব নিয়ম-কানুন মেনে চলা কিংবা অগ্রাহ্য করা, দুটোই খুব অস্বস্তিকর। পরমেশ ভোজনরসিক নন, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে পেড়াপেড়ি অনেক সময় সাংঘাতিক বিরক্তিকর অবস্থায় পৌঁছে যায়।

কিন্তু গ্রামে আর আলাদা থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে! উঠতেই হবে কারুর না কারুর বাড়িতে। পরমেশ তাতেই রাজি হলেন।

গ্রামের নাম গড়বন্দীপুর। কলকাতার ময়দান থেকে আরামবাগের বাস ছাড়ে। সেই যাত্রাটি বেশ সুখকরই হল। নির্দিষ্ট দিনে মহিম নামে একটি যুবক এসেছে পরমেশকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। সে বেশ যত্ন করে জানলার ধারের সীটে পরমেশকে বসালো। সদ্য শীত শেষ হয়েছে, গরম সেভাবে এখনো পড়েনি, দু' পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল।

আরামবাগ থেকে বাস বদলাতে হয়। সেখানেই ঘটলো বিপত্তি। চলতি রুটের বাস, মাঝখানের কোন জায়গা থেকে ওঠা এক সাংঘাতিক ব্যাপার। এ বাসের চতুর্দিক দিয়ে লোক ঝোলে, বাসের মাথাতেও অনেক লোক।

আরামবাগে সে বাস থামতেই কিছু লোক নামে, আর তার চেয়েও বেশি লোক ছুটে যায় গেটের দিকে, তাবপরই শুরু হয় মারামারি ঠেলাঠেলি। পরমেশ এ বাসে উঠবেন কী করে?

প্রথম বাসটি ছেড়ে দিতে হল।

এখানে একজনও পরমেশকে চিনতে পারেনি। কলকাতার যে-কোনো মোড়ে দাঁড়ালে কিছু কিছু লোক তাঁর দিকে ফিরে ফিরে চায়, দু'একটি ছেলে-মেয়ে এসে নমস্কার করে, কথা বলে। পরমেশের ছবি ছাপা হয়েছে অনেক, তাছাড়া টেলিভিশানের কল্যাণে অনেকেই আজ-কাল বিখ্যাত সাহিত্যিকদের চেহারা জেনে গেছে।

এই রকম হঠাৎ কেউ এসে কথা বললে কিংবা শ্রদ্ধা জানালে সাবলীলভাবে ঘোরা যায় না। এখানে পরমেশের কোনো অস্বস্তি লাগছে না।

মহিম কাঁচুমাচু ভাবে বলল, কী হবে, স্যার! এখান থেকে তো আলাদা গাড়িও পাওয়া যাবে না। সাইকেল-ভ্যানে কি আপনি যেতে পারবেন? তাও অনেকটা দূর পড়ে যাবে!

পরমেশ ছেলেটির মুখের দিকে পুরোপুরি তাকিয়ে বললেন, তুমি আমাকে স্যার স্যার বলছ কেন? আমি তো স্কুল-কলেজে পড়াই না।

মহিম একটু অবাক হয়ে গেল। থানার দারোগা কিংবা বি. ডি. ও. সাহেবকেও তো স্যার বলতে হয়।

পরমেশ বললেন, এর পরের বাসটা আসুক। ভিড় থাকলেও তাতেই উঠব।

আপনি পারবেন না, স্যার।

কেন পারব না? খুব বুড়ো হয়ে গেছি? আমার চেয়েও তে বয়স্ক লোকেরা ছাদে বসে যাচ্ছে।

আপনার অভ্যেস নেই তো।

পরের বাসে সত্যিই পরমেশ ঠেলেঠুলে উঠে পড়লেন। এই কৃতিত্বে তাঁর বেশ আনন্দ হল। তিনি বিখ্যাত মানুষ, আজকাল গাড়ি ছাড়া ট্রাম-বাসে চাপেনই না। তবু তাঁর ভেতরের সাধারণ মানুষটি এখনো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তিনি এখনো পারেন।

এবারে যেখানে নামা হল, সেখান থেকে আরও তু'মাইল যেতে হবে। সাইকেল-ভ্যান ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই। সেরকম তু'খানা সাইকেল-ভ্যান দাঁড়িয়েও আছে। ঐ ধরনের গাড়িতে মালপত্তরও যায়, মানুষও যায়।

সাইকেল-ভ্যানে যাওয়াটা পরমেশের পছন্দ হল না। তিনি বললেন, মোটে তু'মাইল রাস্তা তো, চল, হেঁটেই যাই।

মহিম আবার কিন্তু-কিন্তু করতে লাগল।

বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। তু'দিকে ফাঁকা মাঠ। সামনে গ্রামখানি অস্পষ্ট দেখা যায়। সূর্য ডুব দিচ্ছে। সেদিকেই হাঁটতে হাঁটতে পরমেশ ভাবলেন, এরকম একটা গ্রামের সভায় ক'জন লোক আসবে। এর জন্যও কলকাতা থেকে সভাপতি আনা দরকার?

অন্তত বছর দশেকের মধ্যে পরমেশ এরকম কোনো গ্রাম্য রাস্তা ধরে হাঁটেননি। তবু পরমেশের খারাপ লাগছে না। সামান্য হেসে তিনি ভাবলেন, তাঁর মতন আর কোনো লেখক কি কখনো পায়ে হেঁটে সভাপতিত্ব করতে গেছে?

স্কুল-বাড়ির চত্বরে তিন-চারজন লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল, মহিম আর পরমেশ সেখানে পৌঁছোবার পর তারা খুব একটা সরবে অভ্যর্থনা

জানাল না। একজন শুধু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন, আসুন, স্যার! কোনো কষ্ট হয়নি তো?

আর একজন বলল, মহিম, তুই ওনাকে এতটা রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে এলি? কেন, ভ্যান ছিল না?

মহিম সেই লোকটির কানে কানে কী সব জানাল। তারপর পরমেশের সামনে এসে বলল, স্যার, আপনি একটু বিশ্রাম নিন। আমাদের সেক্রেটারি মজুমদারমশাইকে আমি এক্ষুণি ডেকে আনছি।

পবমেশ একটা চেয়ারে বসলেন। মহিম চলে গেল। অন্য লোকেরা চুপচাপ। ঠিক কী কথা বলবে বুঝতে পারছে না।

পরমেশ সেই লোকগুলির মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলেন, এরা কেউ তাঁর কোনো লেখা পড়েনি। মেয়েরা যেমন বুঝতে পারে কোন্ পুরুষমানুষ তাদের দিকে কোন্ নজরে তাকাচ্ছে, লেখকরাও তেমনি মানুষ দেখলেই চিনতে পারে কে পাঠক আর কে পাঠক নয়।

এই রকম পাড়াগাঁয়ে বইপত্র বিশেষ পৌঁছোয় না। এখানে যে তাঁর অনেক ভক্ত পাঠক থাকবে পরমেশ তা ঠিক আশাও করেননি। কিন্তু একটা কথা তিনি আগে ভাবেননি, এখন ভাবলেন। এরা হঠাৎ তাঁকে সভাপতি করে আনার জন্য এত জেদ ধরল কেন? স্কুলের ব্যাপার, এরা কোনো রাজনৈতিক নেতাকে আনলেই তো পারত। নেতারা যেমন বক্তৃতা দিতে পারে গরম-গরম, তেমনি ইচ্ছে করলে এই স্কুলের জন্য কিছু সাহায্য টাহায্যেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারে। পরমেশকে দিয়ে তো সে রকম কোনো উপকার হবে না!

স্যার, আপনি ডাবের জল খাবেন, তেষ্টা পেয়েছে?

পরমেশ বললেন, না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এখন আর ডাব খাব না।

চা খাবেন? আনিয়ে দিতে পারি, কাছেই দোকান আছে।

থাক না, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? পরে হাত-পা ধুয়ে যা হয় করা যাবে।

আমাদের সেক্রেটারি মজুমদারমশাই এতক্ষণ এখানেই বসেছিলেন। এই তো উঠে গেলেন! স্যার, কলকাতার কোথায় আপনার বাড়ি?

যোধপুর পার্কে।

ডাক্তার সুবোধ দত্তকে চেনেন? আমাদের গ্রামেরই ছেলে, এখন

ভবানীপুরে চেম্বার খুলেছে।

পরমেশ মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি ঐ নামের কোনো ডাক্তারকে চেনেন না।

লোকটি আবার বলল, খুব নাম করেছে। পি. জি. হসপিটালের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড। আমাদের এই গ্রামের স্কুলেরই ছাত্র। চেনেন না?

পরমেশ কয়েকজন খ্যাতিমান ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু তিনি সুবোধ দত্তর নাম শোনেন নি। ডাক্তার সুবোধ দত্ত এখানকার কৃতী সন্তান এবং গ্রামের লোকদের কাছে গর্বের বস্তু হলেও কলকাতার হাজার হাজার ডাক্তারের মধ্যে তিনি একজন মাত্র।

পরমেশ চুপ করে রইলেন।

লোকাটি নাছোড়বান্দা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, ধরণীধর মাইতিকে চেনেন? বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসার। উনিও এই গ্রামের মানে এই গ্রামে ওনার মামার বাড়ি। খুব ফেমাস 'হয়েছেন। উনিও বই-টই লেখেন।

কী বই?

তা ঠিক বলতে পারব না। কলেজেরই বই বোধহয়।

লোকটিকে আর নিরাশ না করে পরমেশ বললেন, হ্যাঁ, ওঁর নাম শুনেছি বৈকি। বিখ্যাত লোক। আপনাদের এই গ্রাম থেকে তো অনেক বিখ্যাত লোক বেরিয়েছে।

ইস্কুলটার জন্য আমরা খুব যত্ন করি। আমাদের সেক্রেটারি তো প্র্যাকটিকালি এই ইস্কুলের জন্য এত লেবার দ্যান—

আর একজন বলল, আমাদের ইস্কুলটা ক্লাস এইট পর্যন্ত। তবে এ বছর থেকেই ক্লাস টেন করার হেভি ট্রাই দিচ্ছি। প্র্যাকটিক্যাল বিল্ডিংটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই।

গ্রামের লোকজন আজকাল আর খাঁটি বাংলায় কথা বলে না। যেখানে-সেখানে ভুল ইংরিজি শব্দ তারা ব্যবহার করবেই। শিক্ষা বিস্তারের এই সুফল।

পরমেশ এবারে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন। এখানে তাঁকে বসিয়ে রাখার কী মানে হয়। যেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে

তুললেই তো পারত। জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুতে পারতেন। এখানে এই লোকগুলোর বাজে বকবকানি শুনতে তাঁর একটুও ইচ্ছে করছে না।

স্কুল বাড়িটার খানিকটা অংশ টিনের চাল, খানিকটা অংশ পাকা। সামনে টানা লম্বা বারান্দা। চত্বরের মাঝখানে বেশ বড় একটা বট গাছ। সেই গাছের নিচে একটা কী যেন ঠাকুরের মূর্তিও আছে। এই জন্যই স্কুল বানাবার সময় গাছটা কেটে ফেলা হয়নি।

পরমেশ জিজ্ঞেস করল, ফাংশান কখন?

কাল সকালে।

কাল বিকেলে কলকাতায় ফেরার বাস আছে?

আপনি কালই রিটার্ন করবেন স্যার? দু' একটা দিন থেকে যান না। আপনাদের মতন ইমপর্টাণ্ট লোক তো এদিকে বেশি আসে না।

এই সময় দেখা গেল স্কুলের পেছন দিক থেকে ছোট্ট একটি দল আসছে।

ধুতির ওপর কালো কোট পরা লোকটিই নিশ্চয়ই সেক্রেটারি। এখন আর শীত নেই, অবু উনি কোট ছাড়েননি। দেখলেই মনে হয় মফঃস্বল শহরের কাপড়ের দোকানের মালিক। সঙ্গে আরও দু'তিনজন লোক দুটি মহিলা ও তিন চারটে বাচ্চা।

খানিকটা দূর থেকেই সেক্রেটারিমশাই নমস্কার, নমস্কার বলতে বলতে এলেন। তারপর কাছে এসে বললেন, আপনার আসতে এত দেরি হল? আমরা ভেবেছিলুম বেলাবেলি এসে পৌঁছবেন। প্র্যাকটিক্যালি সব ব্যবস্থা রেডি রেখেছিলুম। দেরি হল কেন?

এই প্রশ্নের নানা রকম উত্তর হতে পারে। পরমেশ বললেন, কী জানি!

মেয়ে দুটি পরমেশের পায়ের কাছে বসে পড়ে প্রণাম করতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বললেন, একি, আরে থাক থাক।

একটি মেয়ে মুখ তুলে নিবিড়ভাবে পরমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আপ্লুত গলায় বলল, আপনি···আপনিই পরমেশ চট্টোপাধ্যায়···সত্যি

আপনি···আমাদের এই ছোট্ট গ্রামখানিতে এসেছেন ?

পরমেশ বুঝলেন, এই মেয়েটি তাঁর পাঠিকা। একজন দু'জন তো থাকবেই।

মেয়েটির বয়েস বছর পঁচিশেক হবে বোধহয়, গায়ের রং মাজা-মাজা, মাথায় অনেক চুল আছে। চোখ দুটিতে ভাষা আছে। ওর মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে।

প্রথম নজরেই পরমেশ লক্ষ্য করলেন যে মেয়েটির সিঁথিতে সিঁদুর নেই। এই বয়েসী একটি গ্রামের মেয়ের এখনো বিয়ে না হওয়া বেশ অস্বাভাবিক।

অন্য মেয়েটি বিবাহিত, তার চেহারায় ও চোখ-মুখে কোনো বৈশিষ্ট নেই।

সেক্রেটারিমশাই বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই হল জোছ্‌না। জোছ্‌না। কর্মকার। আপনার অনেক বইটই পড়েছে। আমাদের ইস্কুলের টিচার, আর এ হল বাসন্তী মণ্ডল। এ-ও টিচার, আর উনি হারাধন দাস, আর উনি···জ্যোৎস্না কর্মকার ছাড়া আর কোনো নামই পরমেশ মন দিয়ে শুনলেন না। এরকম কত জায়গায় যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, সকলকে মনে রাখা একটা অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া স্মৃতির ওপর এত চাপ দেবার দরকারই বা কি ?

জ্যোৎস্না নামের মেয়েটি এখনো তাঁর দিকে একেবারে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পরমেশ একটু অস্বস্তি লাগছে। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

তিনি ভাবলেন, জ্যোৎস্না কর্মকার ? কর্মকার পদবীর কোনো লোককে কে তিনি চেনেন ? এইসব পদবীর মানুষরা লেখাপড়ার জগতে খুব বেশিদিন আসেনি। বাঙালী লেখকেরা যেমন অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বা বৈদ্য, বাংলা বইয়ের পাঠকরাও অধিকাংশই তাই।

সেই দিক থেকে, গ্রামের মেয়ে ও এই কর্মকার বাড়ির মেয়েটি তাঁর বই পড়েছে ?

একটু পরেই আট-দশটি বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলো আর একজন ঢ্যাঙা মতন লোক। লোকটির গায়ের পাঞ্জাবীর ঝুল হাঁটু

ছাড়িয়ে নিচে নেমে গেছে।

শিশুদের দলটি দেখেই মহিম বলল, ঐ তো, ওরা এসে গেছে। আসুন স্যার! আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, এরপর আপনাকে বিশ্রাম করতে নিয়ে যাব।

অন্যদের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ স্কুল প্রাঙ্গণের মাঝখানে এলেন। বালকের দল তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ালো। তাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা করে যুঁই ফুলের মালা।

জ্যোৎস্না এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, এবারে সে পরমেশের একেবারে সামনে এসে হাত জোড় করে বলল, হে কবি, আপনার পদধূলিতে আমাদের গ্রাম আজ ধন্য হল। আপনার প্রতিভার আলোকে আমরা বিমোহিত। গড়বন্দীপুর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আপনাকে সম্বর্ধনা জানাবে। সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন থেকে তারা আপনার পদার্পণের জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিন।

পরমেশ বিব্রতভাবে বললেন, আরে, এসবের কী দরকার!

জ্যোৎস্না বলল, আপনি বিরাট, আমরা অতি ক্ষুদ্র। আপনি গগনাধিপতি, আমরা জোনাকি! তবু আমাদের এই স্পর্ধাকে আপনি প্রশ্রয় দিন।

মজুমদারমশাই বললেন, জ্যোছনা শুরু করে দাও না।

পরমেশ মনে মনে ভাবলেন, জ্যোৎস্না নামের মেয়েটা নিশ্চয়ই এই সব কথাগুলো আগে থেকে মুখস্থ করে রেখেছে। মেয়েটার বোধহয় কবিতা লেখার বাতিক আছে।

জ্যোৎস্নার নির্দেশে বাচ্চাদের দল এবারে ঘুরে ঘুরে একটা গান গাইতে লাগলো। সে গানের যেমন কথার ছিরি, তেমনি সুর!

হে কবি তোমারে জানাই প্রণতি
আমরা অবোধ, অভাজন অতি
গড়বন্দীপুর ধন্য আজি—ইত্যাদি

ঘুরে ঘুরে গান গাইতে গাইতে এক একজন এসে মালা পরিয়ে দিতে লাগল পরমেশের গলায়। তিনি বেশ লম্বা মানুষ, বারবার তাঁকে মাথা নিচু করতে হচ্ছে। বিষম হাসি পাচ্ছে তাঁর, অতিকষ্টে তিনি চেপে

রাখছেন।

এই ধরনের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের আমলের পর শেষ হয়ে গেছে। সাহিত্যিকরা আজকাল গুরুদেব কিংবা গুরু ঠাকুরের ভূমিকা গ্রহণ করতে পছন্দ করে না। ছেলেরা শুধু তাঁর গলায় মালা পরাচ্ছে না, পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করছে।

এরা কেউ তাঁর একটি লাইনও লেখা পড়েনি।

অনুষ্ঠানটি শেষ হলে মজুমদারমশাই বেশ তারিফের সুরে বললেন, বাঃ, বাঃ, বেশ বেশ! জানলেন চাটুজ্যেমশাই, এই গানটা জোছনাই লিখেছে আর সুর দিয়েছে। ছেলেদের ও-ই তো সব শেখায়।

মিথ্যে প্রশংসাবাণী দেওয়া তার স্বভাব নয় বলেই পরমেশ কিছু মন্তব্য না করে শুধু একটু ভদ্রতার হাসি দিলেন।

'চাটুজ্যে মশাই' সম্বোধনটি তাঁর বেশ পছন্দই হল। বেশ একটা গ্রাম্য গ্রাম্য গন্ধ আছে। শহরে তাঁকে এই ভাবে কেউ ডাকে না।

মহিম বলল, জ্যাঠামশাই, এবারে তা হলে স্যারকে আপনার বাড়িতে—

মজুমদারমশাই বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পুরো দলটাই চললো তাদের পেছন পেছন।

সরু গ্রাম্য পথ, মাঝে মাঝে কয়েকটি টিনের বাড়ি। সে সব বাড়ি থেকে মানুষজন বেরিয়ে গ্রামের এই সম্মানিত অতিথিকে কৌতূহলী ভাবে দেখতে লাগলো।

খানিক দূর যাবার পর মজুমদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ক্যালকাটার কোন্ এস্টেজে আপনার বই প্লে হয়?

পরমেশ প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারেননি। তবে তিনি কিছু বলার আগেই জ্যোৎস্না বলল, জ্যাঠামশাই, উনি নাটক লেখেন না। উনি কবিতা আর গল্প লেখেন।

মজুমদারমশাই বললেন, গল্প? কোন্ সিনেমার গল্প?

জ্যোৎস্না আবার বলল, সিনেমার গল্প নয়। উনি বই লেখেন। আমাদের ইস্কুলের লাইব্রেরিতেও ওঁর লেখা বই আছে।

মজুমদারমশাই বললেন, তাই বুঝি? আমি বইটই তো বিশেষ

পড়ি না। সময় কোথায়? আমার ছোট বৌমা খুব বই পড়ে দেখেছি। বি. এ. পাশ তো!

এই ধরনের বাক্য পরমেশ বহুবার বহু জায়গায় শুনেছেন। যেন কারুর অভিশাপে সাধারণ সংসারী বাঙালীদের সাহিত্যপাঠ নিষিদ্ধ। বই পড়বে শুধু মেয়েরা।

এক সময়ে এসে তারা থামলো মজুমদার মশাইয়ের বাড়ির সামনের গেটে।

॥ দুই ॥

সম্ভবত এ গ্রামে এটাই একমাত্র পাকা বাড়ি। বেশি বড় নয়। একতলায় চার-পাঁচখানি ঘর। দোতলায় একটি মাত্র ঘর। সামনে বেশ বড় বাগান। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা কম্পাউণ্ড।

মাননীয় অতিথিকে দোতলার ঘরখানিই দেওয়া হয়েছে। সেখানে এসেও পরমেশ এক মুহূর্ত নিভৃত বিশ্রাম পেলেন না। পাঁচ ছ'জন সে ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো। একটি পুরোনো আমলের পালঙ্ক ছাড়া আর দুটি মাত্র চেয়ার রয়েছে সেখানে, তারই মধ্যে ঠাসাঠাসি করে তারা বসলো।

মহিম বলল, জামা-কাপড় ছেড়ে নিন স্যার! আরাম করে বসুন!

এত লোকজনের মধ্যে কেউ জামা-কাপড় ছাড়তে পারে?

এদের সে বুদ্ধিটাও নেই। পরমেশ বিরসভাবে বললেন, না না, ঠিক আছে! পরে ছাড়লেই হবে।

একজন মাঝবয়েসী লোক একটা পেতলের থালা ভর্তি পাঁচ-ছ' রকমের মিষ্টি নিয়ে এলো।

অত মিষ্টি দেখে আরও মনটা ব্যাজার হয়ে গেল পরমেশের। কোনো মধ্যবয়েসী মানুষের এত মিষ্টি খাওয়া আর বিষ খাওয়া তো একই কথা!

তিনি বললেন, এসব দরকার নেই। এক কাপ চা যদি পাওয়া যায়—

দু'তিনজন একসঙ্গে বলল, না, না, খান! খুব ভাল মিষ্টি আরামবাগ

থেকে আনানো হয়েছে !

পরমেশ বললেন, আমি মিষ্টি খাই না।

খেয়ে দেখুন, আরামবাগের মিষ্টি।

আমার মিষ্টি খেতে ভাল লাগে না !

বলছি তো স্যার, খেয়ে দেখুন না। আরামবাগ থেকে আপনার জন্যই আনা হয়েছে।

পরমেশ বদমেজাজী মানুষ। একবার তাঁর ইচ্ছে হল, থালা শুদ্ধ মিষ্টিগুলো সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে। তাঁর ভাল লাগা—মন্দ লাগার যেন কোন গুরুত্বই নেই, এগুলো যে আরামবাগ থেকে আনানো হয়েছে, সেটাই বড় ব্যাপার।

মজুমদারমশাই আর জ্যোৎস্না একটু আগে বেরিয়ে গিয়েছিল, এই সময় তুজনেই আবার এলো। জ্যোৎস্নার হাতে একটা ট্রে। তাতে পাঁচটা গেলাস আর কাপ ভর্তি চা।

পরমেশ একটা গেলাসের দিকে হাত বাড়াতেই মজুমদারমশাই বললেন, আরে না, না, আপনি কাপটা নিন ! কী ব্যাপার জানেন তো, আমরা তো সবাই গেলাশেই চা খাই। বাড়িতে কাপ-ডিসের পাট নেই। কিন্তু আপনারা নাকি কাপ-প্লেটে ছাড়া চা খেতে পারেন না, তাই জোছনা নিজে আপনার জন্য একটা কাপ কিনে এনেছে ! হে—হে—হে !

এই দারুণ হাসির কথাটিতে সকলেই বেশ উচ্চহাস্য করল। সেটা থামলে একজন বলল, জ্যাঠামশাই, উনি মিষ্টি খেতে চাইছেন না।

মজুমদারমশাই বললেন, সেকি ! আপনার জন্যই এস্পেশালি এনেছি। খেয়ে দেখুন, এদিককার মিষ্টি এমন খাঁটি জিনিস শহরে আর পাবেন না।

পরমেশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, আমি মিষ্টি-ফিষ্টি খাই না।

জ্যোৎস্না তার চোখে চোখ রেখে গাঢ় গলায় বললেন, কবি, আপনি মিষ্টি খাবেন না। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আপনার জন্য আমরা আমাদের সামান্য নৈবেদ্য সাজিয়ে এনেছি—

পরমেশ মাঝপথে ওর কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি বলছো, তাই

তোমার অনুরোধে একটা খাচ্ছি। বাকিগুলো অন্যদের দাও!

মজুমদারমশাই অন্যদের বললেন, চা-টা খেয়ে তোমরা এবার বাড়ি যাও! চাটুজ্যেমশাই এখন বিশ্রাম করবেন। মহিম, তুমি একটু থেকে যাও বরং।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে তিনি পরমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি মানী লোক, যত্নআত্যির ত্রুটি হলে নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন, বুঝলেন না, আমার বাড়ীতে তো কেউ নেই। গিন্নি তো মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। তিনটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিইছি। ছোট ছেলেটা দুর্গাপুরে চাকরি পেল, ছোট বৌমাকেও নিয়ে গেল গত মাসে। বড় ছেলে শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে, সেখানেই থাকতে হয় এখন, তিনখানা গ্রাম পরে। নিজের লোক বলতে কেউ আর সঙ্গে থাকে না। এই মহিম আর জোছ্না আপনার দেখাশোনা করবে।

মহিম বলল, আমরা তো আছিই জ্যাঠামশাই!

জ্যোৎস্না যখন কথা বলে না তখনো সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পরমেশের দিকে। দু'একবার চোখে চোখ পড়তে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। এরকমভাবে কেউ চেয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে।

মজুমদারমশাই বললেন, কাল ফাংশান, তারপর আপনি আরও দু'চারদিন থেকে যান না, আরও বেশি দিনও থাকতে পারেন। আমি অবশ্য পর্শু একবার সদরে যাব, একটা মামলা আছে, কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। এরা তো সব আছেই।

নেহাৎ কথা চালাবার জন্যই পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, কিসের মামলা?

জমির। জমি থাকলেই মামলা-মোকদ্দমা লেগে থাকবেই।

আপনার কতটা জমি?

আজকাল কি জমি রাখার উপায় আছে? জানেনই তো! লোকে হিংসেতে একেবারে জ্বলেপুড়ে মরে। তাছাড়া বর্গাদারের নাম লিখিয়ে নিলে সে জমি তো গেল। তবু ষাটেক বিঘের মতন আছে এখনো।

নিজে চাষ করান?

অবশ্যই। আর বর্গা বসাই! আর একটা গম-পেষাই মেশিন আছে, দুটো পাম্পও ভাড়া দিই, এতেই কোনোরকমে চলে যায়।

পরমেশ ঘোষিতভাবে বামপন্থী নন ; কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্রব নেই। কিন্তু যারা সাহিত্যচর্চা করে, তারা সকলেই আবেগপ্রবণ হয়, তারা শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধেই সব সময় কথা বলে। পরমেশ আরও একটু উগ্রভাবে ধনী সম্প্রদায়ের বিরোধী।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই ব্যাটা একটা জোতদার। ষাট বিঘে জমি, গম-পেষাই কল, পাম্পসেট এত সব থাকা সত্ত্বেও বলে কিনা কোনোরকমে চলে যায়।

একটা জোতদারের বাড়িতে আতিথ্য নিতে হয়েছে বলে তিনি মনে মনে আবার বিরক্ত হলেন। কিন্তু উপায় কী, গ্রামে এসে কি কোনো দরিদ্র কৃষকের বাড়িতে ওঠা যায়? যাই হোক, কালই তিনি এখান থেকে চলে যাবেন ঠিক করে ফেললেন।

বিষয়ী মানুষের স্বভাব এই যে একবার বিষয়-সম্পত্তির কথা উঠলে তারা আর থামতে চায় না। মজুমদারমশাইও এক নাগাড়ে অপারেশন বর্গা, আর জে. এল. ও. অফিস, পঞ্চায়েত, সরকারি রাজনীতি, আলু-চাষের লাভক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে বলে যেতে লাগলেন।

মহিম আর জ্যোৎস্না উসখুস করছে, ওদের নিজস্ব কিছু বলবার আছে। কিন্তু ওরা মজুমদারমশাইকে ভয় পায় কিংবা সমীহ করে, তাই বাধা দিতে পারছে না।

এক সময় পরমেশ হঠাৎ বললেন, আচ্ছা মজুমদারমশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? ঠিক উত্তর দেবেন?

হ্যাঁ। নিশ্চয়! কী জানতে চান বলুন? অবশ্য আমি মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, আপনারা জ্ঞানী, বই লেখেন, আমি আর কী-ই বা জানি!

না, সে রকম কথা নয়। একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। বলছি যে, আপনি তো জীবনে অনেক কিছুই পেয়েছেন। আপনার মেয়েদের ভাল-ভাবেই বিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আপনার ছোট ছেলে চাকরি করে, আপনার বড় ছেলে শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়েছে। আপনার স্ত্রীও স্বর্গে গেছেন। তবু আপনি এখনো বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এসব কার জন্য? প্রয়োজন না থাকলেও যে মানুষ সব সময় টাকা পয়সার চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাতে কী আনন্দ পাওয়া যায় বলুন তো?

মজুমদারমশাই প্রথমটায় যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর এক গাল হেসে বললেন, কই, আমি তো আর আজকাল টাকা পয়সার চিন্তা করি না!

এই যে জমি নিয়ে এখনো মামলা-মোকদ্দমার জন্য আপনাকে সদরে দৌড়তে হয়। বর্গাদারদের হাত এড়াবার জন্য নিজেই জমি চাষ করাচ্ছেন···

একটু নজর না রাখলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে নেবে যে! এই দেখুন না, ইস্কুলটার যা অবস্থা, আমি হাল ধরে না রাখলে কবে উঠে যেত!

হঠাৎ অন্যদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি বললেন, কই হে, তোমরা এখনো বসে রইলে যে! এনাকে এবারে একটু বিশ্রাম করতে দাও।

উঠে দাঁড়িয়ে মজুমদারমশাই বললেন, আমাকে একটু বেরুতে হচ্ছে, পাম্প দুখানার জন্য কিছু ডিজেল স্টক করা দরকার।

ঘর অনেকটা ফাঁকা হয়ে যাবার পর পরমেশ বললেন, এবারে জামা কাপড় ছাড়বো, বাথরুমটা কোথায়?

জ্যোৎস্না আর মহিম চোখাচোখি করলো।

তারপর মহিম বলল, স্যার, বাথরুম বলতে সেরকম কিছু নেই। নিচে কুয়ো আছে, আপনাকে আর সেখানে যেতে হবে না। এই ছাদেই আপনার জন্য বালতি করে জল এনে দিচ্ছি।

পরমেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাথরুম নেই?

মহিম আমতা-আমতা করে বলল, মানে, একবার তৈরি করার কথা হয়েছিল, এনার ছোট ছেলের বউ যদি থাকতো এখানে, কিন্তু সে তো রইলো না? আমি জল এনে দিচ্ছি!

পরমেশ অস্ফুট স্বরে বললেন, পাকা বাড়ি অথচ বাথরুম নেই?

জ্যোৎস্না প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, কবিবর, জানি এখানে আপনার অনেক অসুবিধে হবে। আপনি নগর সভ্যতার আধুনিকতম সব উপাদান ব্যবহারে অভ্যস্ত, আমরা এই নগণ্য গ্রামে প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মধ্যে রয়ে গেছি!

পরমেশের এবারে বেশ রাগ হল মেয়েটির ওপর। কী সব ন্যাকা-ন্যাকা কথা শুরু করেছে প্রথম থেকেই। অনেকে ভাবে সাহিত্যিকের কাছে এলেই বুঝি সাহিত্যের ভাষায় কথা বলতে হয়।

তিনি বেশ রুক্ষভাবেই বললেন, তোমরা একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও! আমি লোকজনের সামনে জামা ছাড়তে পারি না!

ওরা চলে যাবার পর তিনি ব্যাগ খুলে একটা পা-জামা পাঞ্জাবী পরে নিলেন। মনে মনে ভাবলেন, কালকে প্রাতঃকৃত্যের ব্যাপারটা মাঠে সারতে হবে নাকি? আগে জানলে কে এখানে আসতো! মজুমদার-মশাই লোকটা যথেষ্ট অবস্থাপন্ন, একটা পাকা বাড়ি বানিয়েছে, অথচ বাথরুম বানায়নি? ব্যাপারটা জানেই না!

একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি দরজা খুলতেই দেখলেন জ্যোৎস্না একা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। এতক্ষণে পরমেশ খেয়াল করলেন, এ গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। চারপাশটা অন্ধকার। নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। অনেকদিন পর তিনি ঝিঁঝিঁর ডাক শুনলেন।

জ্যোৎস্না নম্রভাবে বলল, আপনার ঘরে একটা হ্যারিকেন আছে, জ্বেলে দেব?

পরমেশ বললেন, দাও! তোমার বাড়ি কত দূরে, জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না বলল, আপনি আমায় অঞ্জনা বলে ডাকবেন।

অঞ্জনা? তোমার ছুটো নাম বুঝি?

না, আমার নাম শুধু জ্যোৎস্না। কিন্তু এ নামটা আমার একটুও পছন্দ হয় না। অনেকদিন থেকেই আমি ভেবে রেখেছি, আপনি যে-দিন আসবেন, সেদিন থেকে আমার একটা অন্য নাম হবে।

অনেকদিন থেকে ভেবে রেখেছ—তার মানে? আমি যে এখানে আসবই, তা তুমি জানতে?

হ্যাঁ। আমি জানতুম, একদিন না একদিন আপনাকে আসতেই হবে!

কী করে তোমার এমন অদ্ভুত ধারণা হল?

আমি যে অনেকদিন ধরেই মনে মনে আপনাকে ডাকছি।

পরমেশ হো-হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর মনের বিরক্তির ভাবটা

কেটে গেল। ঠিক যেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের সংলাপ শুনছেন।

এই সময় মহিম বড় বড় দু'বালতি জল বয়ে এনে দরজার কাছে রাখল। এত বিরাট লোহার বালতি আজকাল শহরে কেউ ব্যবহার করে না।

নিন স্যার! আপনি ইচ্ছে করলে এখানেই স্নান করে নিতে পারেন।

পরমেশ শুধু মুখটা ধুয়ে পায়ে একটু জল দিলেন। তারপর মহিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে। আমার আর কিছু লাগবে না।

মহিম তবু ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

হারিকেনটা জ্বেলে মেঝেতেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে জ্যোৎস্না।

তাদের গ্রামের একটি যুবতী মেয়েকে একলা একজন শহুরে মানুষের কাছে রেখে যেতে বোধহয় ভরসা পাচ্ছে না মহিম।

খাটের ওপরে বসে পড়ে পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সন্ধ্যেবেলা এখানে কী কর?

মহিম বলল, কী আর করব। কিছুই তো করার নেই। একটু গল্পসল্প করি কোথাও—

জ্যোৎস্না বলল, ওরা শুধু তাস খেলে।

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখানে যাত্রা-টাত্রা হয় না?

মহিম বলল, হয় দু'তিন বছরে। তবে এ গ্রামে হয় না, ছোট গ্রাম তো! রঘুনাথপুরে হয়। এই তো পাশেই তিন মাইল মোটে।

জ্যোৎস্না বলল, আপনি এখন কী করবেন? আমরা থাকলে কি আপনার সাহিত্য সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে?

আমি বাইরে এসে সাহিত্য-সাধনা করি না।

হয়তো কিছু চিন্তা করবেন!

পরমেশ হাসলেন। মহিম এবারে গ্যাঁট হয়ে একটা চেয়ারে বসল।

জ্যোৎস্না আবার জিজ্ঞেস করল, যদি অনুমতি দেন, একটা কথা বলব?

বল।

আপনি এখন একটু বেড়াতে বেরুবেন? আমদের গ্রামটা একটু দেখবেন?

এই অন্ধকারের মধ্যে কী করে গ্রাম দেখব?

একটু পরেই চাঁদ উঠবে। হাঁটতে হাঁটতে আপনি আমাদের বাড়ী পর্যন্ত যাবেন। আমি অনেকদিন ধরে ভেবে রেখেছি একদিন চাঁদনি রাতে আপনি আমার গৃহ প্রাঙ্গণে পায়ের ধুলো দেবেন। একটা সুন্দর নদীর ধারে আমার বাড়ি।

মহিম বলল, নদী? নদী নয় তো, ওটা তো কাটা খাল।

তুমি চুপ কর তো মহিমদা! কবি, আপনি যাবেন? নদীর নামটি খঞ্জনা!

মহিম আবার বলল, খঞ্জনা? কবে থেকে এ নাম হল! সবাই তো কাটা খালই বলে!

আমি ওর নাম দিয়েছি খঞ্জনা!

পরমেশ বেশ কৌতুক বোধ করছেন। এ মেয়েটা বেশ পাগল তো! রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতায় যেন খঞ্জনা নদীর কথা আছে। তার সঙ্গে ও নিজের নাম মিলিয়ে রেখেছে অঞ্জনা!

পরমেশ এবারে ভালো করে লক্ষ্য করলেন মেয়েটিকে। এর স্বাস্থ্য ভাল, রংটাও মাজা-মাজা, চোখ-মুখ-নাক কোনটাই তেমন খারাপ নয়। তবু সব মিলিয়ে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না। কী যেন একটা খুঁত আছে। কিংবা এরই নাম বোধহয় গ্রাম্যতা। অথচ গ্রাম্য সরলতাও এর নেই। এর চেয়ে খারাপ চেহারার অনেক শহুরে মেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে। এই মেয়েটি যেন শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি।

তুমি কবিতা লেখো নাকি?

জ্যোৎস্নার বদলে মহিমই বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, ও কবিতা লেখে। ছোটবেলা থেকেই ভাল ভাল পদ্য লেখে।

জ্যোৎস্না লজ্জা পেয়ে শরীর মোচড়াচ্ছে।

পরমেশ মনে মনে আতঙ্কিত হলেন। এই রে এখনই বোধহয় কবিতা শোনাবে। যখন তখন কাঁচা কবিতা শুনতে তাঁর একটুও ভাল লাগে না।

মহিম বলল, ও ভাল গান করতেও পারে। নিজে নিজেই গান শিখেছে। রেডিও শুনে শুনে গান তোলে।

পরমেশ এবার উদারভাবে বললেন, একখানা গান শোনাও না।

জ্যোৎস্না একেবারে মাথা নুইয়ে ফেলে বলল, না, না, সে আপনাকে শোনাবার মতন নয়।

মেয়েদের গান গাওয়াবার জন্য অন্তত আট দশবার সাধাসাধি করতে হয়। সে দায়িত্বটা অবশ্য মহিমই নিল। সে অনবরত পেড়াপেড়ি করে যেতে লাগল, পরমেশ পায়ের ওপর পা তুলে চুপ করে বসে রইলেন।

শেষ পর্যন্ত জ্যোৎস্না যখন কাতরভাবে চাইলো, তখন তিনি বললেন, নাও, এবার শুরু করো।

প্রথমে গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা লাগছিল, তারপর ঠিক হয়ে গেল। অতি পরিচিত একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত, এতদিন যে বসেছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুণে···! এ গান পরমেশ অন্তত একশোবার শুনেছেন। জ্যোৎস্না নিশ্চয়ই আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে এই গানটাই শোনাবে পরমেশ চট্টোপাধ্যায়কে।

পরমেশ বেশ মন দিয়েই শুনছিলেন গানটা। এই গানও যেন জ্যোৎস্নার রূপেরই মতন! সুরে কোনো ভুল নেই, গলাও বেশ ভাল, তবু যেন ঠিক জমল না। উচ্চারণে আর একটু পালিশ থাকা দরকার ছিল, সুরের ধরা আর ছাড়ার মধ্যে কোনো নিজস্বতা নেই। মনে হয় যেন মাঝারি কোনো গায়িকার নকল।

মহিম আর একখানা গান গাইবার জন্য জ্যোৎস্নাকে পেড়াপেড়ি শুরু করেছিল, পরমেশ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল, তাহলে একটু ঘুরে আসা যাক!

বাড়ি থেকে বেরুবার পর জ্যোৎস্না বলল, মহিমদা, তুমি বাড়ি যাও তাহলে। ওনাকে নিয়ে যাচ্ছি!

মহিম অসহায়ভাবে পরমেশের দিকে তাকাল। তার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না যে এমন কথা বলবে সে যেন কল্পনাই করতে পারেনি। সে এত কষ্ট করে বিখ্যাত সাহিত্যিককে নিয়ে এলো কলকাতা থেকে। এখন সন্ধ্যেবেলা বেড়াবার সময় সে-ই বাদ?

জ্যোৎস্না আবার খানিকটা হুকুমের সুরেই বলল, তোমাকে আসতে হবে না, তুমি বাড়ি যাও!

পরমেশই এবার বললেন, না, না, মহিমও চলুক আমাদের সঙ্গে।

মহিম যেন হাতে স্বর্গ পেল তৎক্ষণাৎ। উৎফুল্ল স্বরে বলল, একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা টর্চ নিয়ে আসি। এই সময় সাপ-খোপ বেরোয়।

দৌড়ে সে আবার ঢুকে গেল একটা বাড়ির মধ্যে।

জ্যোৎস্না এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরমেশের চোখের দিকে। সে দুঃখিত হয়েছে, পরমেশের সঙ্গে সে একলা থাকতে চেয়েছিল।

পরমেশ মুখ টিপে হাসছেন। একটি অনাত্মীয়া যুবতীর সঙ্গে কি রাত্তিরবেলা গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায়? গ্রামের কি এতটা মানসিক বদল হয়েছে? পরমেশ সে রকম কোনো ঝুঁকি নিতে চান না।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জ্যোৎস্না, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

জ্যোৎস্না বলল, আপনি আমায় অঞ্জনা বলে ডাকবেন না?

ঠিক আছে। অঞ্জনা, কে কে আছেন তোমাদের বাড়িতে।

কেউ না। আমি একা।

এই গ্রামে···তুমি একা থাক?

হ্যাঁ। নদীর ধারে একটা কুটিরে আমি একা থাকি।

তোমার বিয়ে হয় নি?

জ্যোৎস্না কোন উত্তর দেবার আগেই ফিরে এলো মহিম। পরমেশ এবার মহিমকেই জিজ্ঞেস করলেন, এই, ইয়ে মানে তোমাদের জ্যোৎস্নার বিয়ে হয় নি? গ্রামের মেয়েদের তো···

মহিম বলল, হ্যাঁ, হয়েছিল খুব অল্প বয়সে।

জ্যোৎস্না এবার তীব্র চোখে তাকাল মহিমের দিকে। মহিম তবু থামল না। সে আবার বলল, ওর বাবা খুব অল্প বয়েসেই ওর বিয়ে দিয়েছিল। তারপর দু'বছরের মধ্যেই—

মহিম চুপ করে যেতে পরমেশ বললেন, বুঝেছি। ইস, খুব দুঃখের ব্যাপার। তখন ওর বয়েস কত?

সতেরো। তারপর সাত আট বছর, হ্যাঁ, ঠিক আট বছর কেটে গেছে।

আজকাল তো···দ্বিতীয়বার বিয়ে এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়? জ্যোৎস্না এত গুণী মেয়ে—

মহিম দ্রুত একবার জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কোনো কথা বলল না।

পরমেশ বুঝলেন, মহিমের এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহ আছে। এখনো জ্যোৎস্নার মন পায়নি।

তিনি এবাবে জিজ্ঞেস করলেন, মহিম, তুমি কী কব এই গ্রামে? তুমিও কি স্কুলে পড়াও?

মহিম মাথা নিচু করে ম্লান গলায় বলল, আজ্ঞে না স্যাব। আমি ক্লাস নাইন অবধি পড়েছি। আমাদেব নিজস্ব কিছু চাষবাস আছে, তাতেই চলে যায়। আব আমি টুকটাক কিছু হাতের কাজ কবি।

হাতেব কাজ মানে?

এই কাঠ কেটে পুতুল-টুতুল বানাই। ওটা আমাব সখ। তা দিয়ে বোজগাব কিছু হয় না। এ গাঁয়ের সবস্বতী পুজোব ঠাকুব তো আমিই বানিয়েছি।

বাঃ। তাব মানে তুমিও তো একজন শিল্পী। তোমাব পুতুলগুলো আমায় দেখিও।

দেখাব স্যাব। যদি একবাব আমাদের বাড়িতে আসেন কালকে।

তোমাদের বাড়িটা কোন্ দিকে? এদিকেই?

ঠিক উল্টো দিকে। যেদিক দিয়ে আপনি গাঁয়ে ঢুকলেন।

কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছেন তিনজনে। এদিকে বাড়ি ঘব বিশেষ নেই। একদিকে চাষের ক্ষেত। অন্যদিকে মাঝে মাঝে এক-আধটা বাড়ি। কোনো কোনো বাড়ির রান্নাঘরে কুপীব আলো জ্বলছে। মানুষজনের কথাবার্তা বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। তবে গোয়ালের পাশ দিয়ে গেলে শোনা যাচ্ছে গরুর ফ-র-র-ব ফ-র-র-ব নিশ্বাস।

জ্যোৎস্না ঠিকই বলেছিল, আকাশে এখন চাঁদ উঠেছে। মেঘ নেই। বাতাসটাও বেশ মিঠে-মিঠে। বেড়াতে খারাপ লাগছে না।

জ্যোৎস্না একেবারে চুপ করে আছে। কথাবার্তা যা বলাব সব মহিমই বলছে।

গ্রামের নানা খবর শোনাবার পর মহিম একবার বলল, জানেন স্যার আমাদের এই জ্যোৎস্না অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে। বিয়ের আগে তো ও মোটে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর তো বিয়ে

হল। পাত্র বেশ ভাল ছিল, কিন্তু ঐ যে বলে না কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? ও তো আবার ফিরে এল এই গ্রামেই···

কোথায় বিয়ে হয়েছিল?

আমাদের ইদিককারই ছেলে, তবে চাকরি করতো টিটাগড়ে। কোন্ টিটাগড় বুঝলেন তো, যেখানে কাগজের কল আছে!

সে তো কলকাতার থেকে বেশি দূরে নয়।

স্যার, আমাদের এই গাঁটাও কলকাতা থেকে বেশি দূর নয়। যদি ট্রেন লাইন থাকতো, আমরাও দু' তিন ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যেতাম। অনেক লোক ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতো।

তা ঠিক!

গাঁয়ে ফিরে আসার পর ও জেদ করে আবার পড়াশুনা ধরলে। বাড়িতেই! নিজে নিজে পড়েছে। যেমন নিজে নিজে গান শিখেছে। তেমনি ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষাও দিলে। এক চান্সে পাশও করে গেল। তা হলেই বুঝে দেখুন, ও মেয়ের মাথা কী রকম।

তারপর কলেজে পড়ার ইচ্ছে হয়নি?

আপনি তো সবই বোঝেন স্যার। বাড়িতে বসে কি কলেজের পড়া হয়? তার জন্য শহরে যাওয়া দরকার। সে যে অনেক খরচের ধাক্কা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মহিম বলল, এই যে আমাদের খাল পাড়। জ্যোৎস্না এটাকেই নদী বলেছে।

খালই বটে, তবে সরল রেখা নয়, গোল হয়ে ঘুরে গেছে। দু' পাশটা একেবারে সমান দেখে বোঝা যায় যে নদী নয়। জল বেশি নেই।

মহিম বলল, এক কালে এদিকে নাকি কোথায় নবাবী আমলের গড় ছিল, সেটাকেই ঘিরে এই খাল। গড়ের অবশ্য চিহ্ন নেই, আমরা তো কোনদিন দেখিনি। এই খালটাই শুধু আছে।

তারপরই যেন কিছু মনে পড়ার ভঙ্গিতে মহিম বলল, আমি এবার যাই স্যার। আমার বাড়িতে কিছু কাজ আছে।

পরমেশ বললেন, না না, এক্ষুণি যাবে কেন? আর একটু থাকো।

ফ্যাকাসে ভাবে হেসে মহিম বলল, না, আমি যাই। জ্যোৎস্না বোধ

হয় আপনার সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলবে।

আর কথা না বাড়িয়ে সে পেছন ফিরে হনহন করে হেঁটে চলে গেল।

খাল পাড়টা একেবারে ফাঁকা। ধার দিয়ে ধার দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। একটু দূরেই ওপারে যাওয়ার জন্য একটা বাঁশের সাঁকো।. কাছাকাছি কোন বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পরমেশ জিজ্ঞেস কবলেন, তোমার বাড়িটা কত দূরে, জ্যোৎস্না?

জ্যোৎস্না মুখ ফিরিয়ে বলল, আপনি আমাকে অঞ্জনা বলে ডাকবেন না?

ও, আচ্ছা। অঞ্জনা, তুমি সত্যিই একটা বাড়িতে একলা থাকো? গ্রামে কোন মেয়ের পক্ষে কি সেভাবে থাকা সম্ভব? এখানে চোর-ডাকাতের ভয় নেই?

বাড়িতে আমার বাবা, পিসীমা আরও অনেকে আছে। আমি একটু দূরে একটা ঘরে আলাদা থাকি। আমি মনে মনে ভাবি, সেটাই আমার বাড়ি। আপনার যদি যেতে ইচ্ছে না করে তো যাবেন না!

যেতে পারি। তবে কি জানো, বেশি অচেনা লোকদের মধ্যে গেলে আমার কী রকম যেন অস্বস্তি হয়।

তবু একবার চলুন।

চলো। মহিম যে বলে গেল আমার সঙ্গে তোমাব প্রাইভেট কথা আছে। সত্যি আছে নাকি?

হ্যাঁ, আছে। ও কী করে জানলো তা জানি না।

কী প্রাইভেট কথা? আমার সঙ্গে তোমার আজই পরিচয় হল।

আপনি বিশ্বাস করছেন না আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি! আপনার সব লেখা আমি পড়িনি, এখানে তো বেশি পাওয়াও যায় না। যে-কটা পেয়েছি, সেগুলোই অনেকবার পড়েছি। সেই সব লেখা পড়ে আপনি মানুষটা কেমন তাও জেনে ফেলেছি।

পরমেশ অনুচ্চ গলায় হাসলেন। তারপর বললেন, এই যে তুমি আমার সঙ্গে এই রকম নির্জন রাস্তায় রাত্রিবেলা বেড়াচ্ছো, এ জন্য

তোমার নিন্দে হবে না ? গ্রামে তো সবাই সব কিছু জেনে যায়।

যে যা বলুক, আমি গ্রাহ্য করি না !

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না একেবারে পরমেশের বুকের কাছে চলে এলো। গ্রীবা উঁচু করে বলল, আপনি আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবেন ?

পরমেশ চমকে গিয়ে একটুখানি পিছিয়ে গেলেন।

বহু জায়গায় ঘুরেছেন তিনি। অনেক রকম মানুষ দেখেছেন। তবুও যেন এ জীবনে বিস্ময়ের শেষ নেই।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় তিনি দেখতে পেলেন মেয়েটি থরথর করে কাঁপছে।

ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য তিনি তরল গলায় বললেন, তোমায় আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো ? এই চমৎকাব গ্রামের পরিবেশ ছেড়ে তুমি কলকাতায় যেতে চাইছো কেন ? কলকাতা অতি বিচ্ছিরি জায়গা !

আপনি আমায় নিয়ে যাবেন কি না বলুন ! এই গ্রাম সুন্দর ? কে বলল আপনাকে ? আমার এখানে অসহ্য লাগে ! দম বন্ধ হয়ে আসে। জানেন না তো এখানকার মানুষের মনের ভেতরটা কত নোংরা ! মেয়েদের এরা কেউ মানুষ বলেই মনে করে না। মেয়েদের যেন আলাদা কোন ইচ্ছে থাকতে নেই, নিজস্বতা বলে কিছু নেই। কী কষ্ট যে এরা দেয় !

তোমার মতন একটি মেয়েকে কি আমি হঠাৎ কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি ? তুমি থাকবে কোথায় ?

কেন, আপনার বাড়িতে একটুখানি জায়গা হবে না ?

আমার বাড়িতে ? ইয়ে···মানে···

সিঁড়ির নিচে একটু জায়গা হলেই আমার চলবে !

তুমি বুঝতে পারছো না, অঞ্জনা···

আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়ার। লেখাপড়া শিখবো। আপনার মতন লেখকদের সঙ্গে মিশবো, কলেজ ষ্ট্রীটের কফি হাউসে, যাব···কত মেয়ে তো সেখানে যায়, আমি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে

পড়েছি, আমি যেতে পারি না ?

তোমার বাবা তোমায় কলেজে পড়াতে রাজি হননি ?

আমার ভালভাবে জ্ঞান হবার আগেই বাবা আমার বিয়ে দিয়ে দিল ! আমার নিজের মা নেই, বাড়িতে অন্য একজন আছে···আমি কলেজে পড়ার কথা বললে বাবা আমাকে মারতে এসেছিল, জানেন আপনারা কি ভাবতে পারেন যে এখানে মেয়েদের গায়ে যখন তখন হাত তোলা হয় ?

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ? সেখানেই তুমি থেকে গেলে না কেন ?

ওর কথা আর তুলবেন না। ওদের কথা আমি ভুলে গেছি। আপনি আমায় নিয়ে যাবেন কি না বলুন।

এরকমভাবে কি নিয়ে যাওয়া যায় ?

এই আকাশ আর বাতাস সাক্ষী, আমি মিথ্যে কথা বললে যেন আমার জিভ খসে যায়। গত এক বছর ধরে আমি সব সময় আপনার কথাই ভেবেছি। মনে মনে আপনাকে শুধু পুজো করেছি বললে ভুল হবে, আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি আমায় নিয়ে চলুন। আপনার বাড়িতে আমি এক কোণে পড়ে থাকবো। আপনার কাছে কবিতা লেখা শিখবো। আপনি যা বলবেন আমি তাই-ই করব।

পরমেশের বাহুতে মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে ফেললো জ্যোৎস্না।

পরমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

নির্জন মাঠের মধ্যে একটি যুবতী মেয়ে তাঁর কাছে প্রেম জানাচ্ছে। অথচ পরমেশের মনে সে-রকম কোন আবেগ জাগছে না, মেয়েটির পিঠে তিনি হাতও রাখলেন না। আজ থেকে দশ বছর আগে হলেও তিনি নিশ্চয়ই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ভুলে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরতেন। চুম্বনের মধ্য দিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে যেত।

কিন্তু এখন যেমন খানিকটা বিব্রত বোধ করলেন, তেমনি তাঁর মায়াও হল মেয়েটির জন্য। মেয়েটির মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। সামান্য একটু সুযোগ পেলে সে হয়তো অনেক উঁচুতে উঠতে পারতো। কিন্তু কে তাকে সেই সুযোগ দেবে ?

পরমেশ ব্যস্ত মানুষ, তাঁর পক্ষে কতটুকুই বা করা সম্ভব। কলকাতায় গিয়ে এই মেয়েটি থাকবেই বা কোথায়?

একটা পঁচিশ বছরের বিধবা যুবতী মেয়েকে পরমেশ তো আর নিজের বাড়িতে স্থান দিতে পারেন না।

পরমেশ মৃদু গলায় বললেন, অঞ্জনা, শোনো, আগে আমার একটা কথা শোনো!

অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে জ্যোৎস্না বলল, কী?

তোমার কিছু কিছু লেখা আমায় দেখিও। যদি ভাল হয়, আমি কলকাতার পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।

আপনি আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবেন না?

এখনই তো তা সম্ভব নয়—

বৌদি রাগ করবেন? আমি বৌদির পায়ে ধরে বুঝিয়ে বলব আমি আপনাদের বাড়ীতে দাসী হয়ে থাকবো।

পাগলামি করো না! আমাদের একটা অন্য জগৎ আছে, সেখানে তুমি খাপ খাবে না! কলকাতা জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়, সেখানে অনেক বাঘ-ভাল্লুক ঘুরে বেড়ায়। এখন তুমি কলকাতায় গেলে তারা তোমায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে ফেলবে। তুমি গ্রামে থেকেই লেখা কিংবা গান-টানের চর্চা করো। তোমার বইপত্রের দরকার হলে আমি তোমায় কিছু কিছু পাঠিয়ে দিতে পারি। তারপর একদিন যখন তোমার নাম হবে, তখন তুমি নিজের পরিচয়েই কলকাতায় যাবে। সবাই তখন সম্মান করবে তোমাকে।

কিন্তু আমি যে এতদিন আপনার ভরসায় বসেছিলুম। আপনার লেখা পড়ে মনে হয়েছিল, আপনি আমার মনের কথা ঠিক বুঝবেন। আপনি আমাকে আপনার কাছে স্থান দেবেন!

তুমি ভুল ভেবেছিলে। লেখকদের কাছে অনেকেই আশ্রয় চায়। কিন্তু লেখকরা তো আর নিজের বাড়িটাকে অনাথ আশ্রম বানিয়ে ফেলতে পারে না!

কথাটা বেশ কঠিন হয়ে গেল। পরমেশ ঠিক এ ভাবে বলতে চান নি। জ্যোৎস্না আহতভাবে তাকিয়ে রইল পরমেশের দিকে।

এবারে পরমেশ ওর কাঁধ ছুঁয়ে নরম গলায় বললেন, আমায় ভুল বুঝো না। আর কয়েকদিন একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে আমি ঠিকই বলেছি। এ রকম ভাবে কলকাতায় যাওয়া যায় না, গেলেও তোমার কোন লাভ হবে না। আগে সেখানে তোমার জায়গা করে নিতে হবে।

আর কোন কথা না বলে জ্যোৎস্না হঠাৎ পেছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করল।

পরমেশ ওকে ডাকলেন না, ফেরাবার চেষ্টা করলেন না! সেখানেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে। আর জ্যোৎস্নার বাড়িতে যাবার বোধহয় কোন প্রশ্ন ওঠে না।

।। তিন ।।

ফেরার জন্য খাল-পাড়ের রাস্তাটা ছেড়ে গ্রামের দিকে আসতেই পরমেশ দেখলেন, একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের নিচে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। যেন তাঁরই প্রতীক্ষায়।

পরমেশ বিশেষ অবাক হলেন না। মহিমই হবে নিশ্চয়ই। এই যুবকটি যে একটি ব্যর্থ প্রেমিক তা তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি কাছে আসবার পর মহিম বলল, আমি আবার ফিরে এলাম। আপনি যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলেন!

পরমেশ বললেন, ভালোই করেছো।

আপনি জ্যোৎস্নাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

আমি যে যাইনি, তা তুমি দেখেছো নিশ্চয়ই! দেখোনি? তুমি তো আগাগোড়া এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলে!

এখান থেকে খালধারটা দেখা যায় না। আমি কিন্তু আপনাদের ওপর নজর রাখার জন্য এখানে দাঁড়াইনি। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম।

তোমার বাড়িতে কে কে আছেন, মহিম?

আজ্ঞে?

তুমি বিয়ে করেছো ?

না, স্যার, এখনো করা হয়ে ওঠেনি।

তোমাদের গ্রামে কি বিধবা বিয়ের ব্যাপারে খুব আপত্তি আছে ? বিদ্যাসাগরমশাই তো এই মেদিনীপুরেরই মানুষ ছিলেন।

আপনি জ্যোৎস্নার বিয়ের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ ভাবছি, তোমাদের গ্রামে একটা ঘটকালি করে যাব। তোমার সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ে দিলে কেমন হয় ?

জ্যোৎস্না রাজি হবে না।

তুমি প্রস্তাব দিয়েছিলে ?

স্যার, আপনি তো দেখলেনই, জ্যোৎস্না অন্য টাইপের মেয়ে। সব সময় বই পড়ে আর কী যেন একটা ভাবের ঘোরে থাকে। অন্য কারুর সঙ্গে তো ভাল করে কথাই বলে না। গ্রামের মধ্যে ও যেন ঠিক ফিট করে না। ছোটবেলায় ও নাকি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে পদ্য বলত। ওর বাবা-দাদারা তো এক সময় ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করত ওর মাথার ঠিক নেই। আপনি তো অনেক মানুষ দেখেছেন। অনেক কিছু জানেন, আপনার কী মনে হল স্যার ? ওকে পাগল মনে হল :

বড় হয়েও কিছু পাগলামি করেছে নাকি ?

একা একা মাঝে মাঝে রাত্তিরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওদের বাড়িতে একটা বাতাবিনেবু গাছ আছে। সেই গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে !

আর কী করে ?

ইস্কুলে ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে কেঁদে ফেলে। এক একদিন এমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে যে ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে যায়।

মেয়েটা আধ-পাগল ধরনের। যারা আধ-পাগল হয় তারা কখনো পুরো পাগল হয় না।

ওর জীবনের আর একটা ঘটনা আছে। সেটা কি আপনাকে বলেছে ?

কোন্ ঘটনা ?

ওদের বাড়িতে একবার ডাকাত পড়েছিল। বছর তিনেক আগেকার কথা।

তবে যে শুনলাম ওরা গরিব? গরিবের বাড়িতেও ডাকাত পড়ে নাকি? ও, বুঝেছি!

বুঝতেই পারছেন, ডাকাত এসেছিল ওকেই ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ওরকম সুন্দরী মেয়ে তো আমাদের এ তল্লাটে নেই। ওর এক পিসতুতো দাদাকে তিন-চারজন ডাকাত মাঠের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নাকে টানতে টানতে অনেকখানি নিয়ে গিয়েছিল। তখন রাত বেশি না, এই ধরুন সাড়ে এগারোটা। গ্রামের অনেক লোক তাড়া করতে ডাকাতগুলো শেষ পর্যন্ত ওকে ফেলে পালিয়ে যায়।

পরমেশের মনটা বিস্বাদ হয়ে গেল। জ্যোৎস্না ঠিকই বলেছিল। ওর মতন মেয়ের পক্ষে স্বাধীনভাবে বেচে থাকা এই রকম গ্রাম-দেশে বুঝি অসম্ভব। যুবতী বিধবার যদি স্বাস্থ্য একটু ভাল হয়, সামান্য রূপের জেল্লা থাকে, তা হলেই তার অনেক বিপদ। কিন্তু জ্যোৎস্নাকে সাহায্য করার কোন উপায়ও তো তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

মহিম বলল, সেবার স্যার ও আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছিল।

তোমাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্না জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। জ্ঞান ফিরে পাবার পর প্রথমেই বলল, আমি নাকি ঐ ডাকাতদের দলে ছিলাম।

তুমি?

হ্যাঁ, স্যার! কী অদ্ভুত কথা বলুন তো! আমাদের গ্রামের মেয়ে তাকে আমি ডাকাতি করে কোথায় নিয়ে যাব? যাই হোক লোকে কেউ বিশ্বাস করেনি, কারণ আমি সেই রাত্রেই চণ্ডীখোলায় বসে তাস খেলছিলুম। সাত আটজন সাক্ষী। আমার কোনোই দোষ নেই, তবু জ্যোৎস্না আমার সঙ্গে এরপর পাঁচ-ছ' মাস কথা বলেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে হাঁটতে লাগলেন পরমেশ। দৃশ্যটা তিনি কল্পনা করবার চেষ্টা করলেন। জ্যোৎস্না কেন মহিমের নাম বলেছিল? মনস্তত্ত্ববিদরা হয়তো বলবেন, জ্যোৎস্নার অবদমিত ইচ্ছে ছিল এটাই যে,

মহিম তাকে জোর করে এ গ্রাম থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে।

একটু বাদে মহিম আবার বলল, জ্যোৎস্নাকে খুব বিয়ে করার ইচ্ছে জ্যাঠামশাইয়ের।

জ্যাঠামশাই, মানে?

মজুমদারমশাই, আমাদের সেক্রেটারি।

উনি? ওঁর বয়েস কত হবে? ষাট পঁয়ষট্টি নিশ্চয়ই!

এ বয়েসেও অনেকে বিয়ে করে।

হ্যাঁ, যাদের টাকা থাকে, তারা বুড়ো বয়েসেও বিয়ে করতে চায় বটে।

জ্যাঠামশাই অবশ্য জোরজার কিছু করেননি। ওনার বউ মারা গেছে, জ্যোৎস্নারও বাড়িতে খুব অসুবিধে, সেই জন্য বলছিলেন···

জ্যোৎস্না কী বলেছিল?

তা আমি জানি না।

তবু জ্যোৎস্না ওর বাড়িতে আসে?

জ্যোৎস্না অনেকটা ওঁর মেয়েব মতন। মজুমদারমশাইও ওকে সেই চোখে দেখেন।

তবু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

হয়তো ভেবেছিলেন, তাতেই জ্যোৎস্না সুখী হবে কিন্তু মেয়েটা যে একেবারে অন্যরকম।

তোমায় বিয়ে করতে ও রাজি নয় কেন?

দেখুন স্যার, আমি বেশি দূর লেখাপড়া শিখিনি। তবে গল্পের বই-টই পড়ি! নবকল্লোল পড়ি। আপনার বইও পড়েছি একখানা। কিন্তু আমি তো পদ্য লিখি না, গান-টানও গাইতে পারি না। জ্যোৎস্নার বোধহয় সেইরকম মানুষই পছন্দ।

তোমাদের বাড়ির অবস্থা কেমন?

আমরা বড়লোক নই। কিন্তু মোটামুটি খাওয়া পরার চিন্তা নেই। দুটো পুকুর জমা নেওয়া আছে।

জ্যোৎস্না কলকাতায় থাকতে চায়।

জানি। আপনাকে ও সেই কথাই বলেছে, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে ও থাকবে কি করে?

আমিই বা কী করে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাই বলুন তো! আমি তো কলকাতায় কোনো চাকরি পাব না। আমার এক পিসতুতো দাদা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বেয়ারার চাকরি করে, তাঁকে বলে দেখতে পারি—

সে চেষ্টা করে লাভ নেই। জ্যোৎস্নার কলকাতায় যাওয়ার ঐ জেদটাও একটা পাগলামি। গ্রামে বসেও তো সাহিত্যচর্চা করা যায়। আমি ওকে বইপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করব বলেছি।

মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে আমিও কিছু কিছু বই কিনে এনে দিতে পারি।

মহিম, তুমি নিজে এতদিন বিয়ে করোনি কি জ্যোৎস্নার জন্য? ধর যদি জ্যোৎস্না রাজি হয়, তোমার বাড়ির সবাই ওকে মেনে নেবে?

আমার মা একটু চ্যাঁচামেচি করবে। সে মাকে আমি ম্যানেজ করতে পারব।

মজুমদারমশাই আপত্তি করবেন না?

মনে হয় তো কিছু বাধা দেবেন না। তাহলে কি আর জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমার মেলামেশা করতে দিতেন?

কথা বলতে বলতে ওরা পৌঁছে গেছে বাড়ির সামনে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মজুমদারমশাই।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, চাটুজ্যেমশাই, কোথায় গিয়েছিলেন? রাত হয়ে গেল, আমি চিন্তেয় পড়ে গিয়েছিলুম। কে যেন বলল, আপনি জোছনার সঙ্গে খাল-পাড় ধরে গেছেন। ওদিকে তো মশাই সাপখোপের রাজত্ব!

পরমেশ বাঁহাতের কব্জি তুলে ঘড়ি দেখলেন। পৌনে আটটা বাজে, তবু মনে হয় যেন অনেক রাত। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে চলেছে অনবরত।

পরমেশ ততক্ষণে মনঃস্থির করে ফেলেছেন যে কাল ফাংশানের পরই তিনি চলে যাবেন! নিরিবিলি কয়েকদিন এই গ্রামে থেকে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথমে এসেই তিনি একটি মেয়ের সমস্যায়

জড়িয়ে পড়েছেন। এখানে তিনি যত বেশি সময় থাকবেন, ততই সমস্যাটা জট পাকাবে।

!কিন্তু গ্রামে এসে গ্রামটার কিছুই দেখা হবে না? গ্রাম কি শুধু [illegible] মেয়ে?

তিনি মজুমদারমশাইকে বললেন, এক্ষুণি বাড়িতে ঢুকে কী করব: অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকা···আপনাদের এখানে মশা কেমন?

মজুমদারমশাই বললেন, সে আপনাকে মশারি খাটিয়ে দেবতখন। আপনি এখন খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

এত সকাল সকাল তো আমার খাওয়ার অভ্যেস নেই। গ্রামের অন্য দিকটা একটু ঘুরে আসা যাক বরং। চল, মহিম, তোমার তাড়া নেই তো?

তিনি বন্ধুর মতন মহিমের কাঁধে হাত রাখলেন।

॥ চার ॥

এরপর মাস ছয়েক কেটে গেছে।

একদিন সকালবেলা পরমেশ লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত রয়েছেন, তারই মধ্যে তাঁর দরজার বেল বাজল। তিনি শুনতে পেলেন দরজা খোলার পর কানাই-এর সঙ্গে কার যেন কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

একটু পরে তাঁর স্ত্রী এসে বললেন, একটা নাছোড়বান্দা লোক এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না!

পরমেশ বিরক্তভাবে তাকালেন। রবিবার ছাড়া অন্য কোনো সকালে তিনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। লেখার মাঝখানে উঠে গিয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে সাঙ্ঘাতিক মানসিক চাপ পড়ে।

পরমেশের স্ত্রী লীনা একটু নরম স্বভাবের মহিলা। তিনি কোনো আগন্তুককে ফিরিয়ে দিতে পারেন না।

লীনা বললেন, দেখে মনে হল অনেক দূর থেকে এসেছে, তুমি দু' এক মিনিট অন্তত কথা বলে এসো!

লেখার যা ক্ষতি হবার তো হয়েই গেছে। পরমেশ সিগারেট ধরিয়ে

বসবার ঘরে এলেন।

একটি সম্পূর্ণ অচেনা চেহারার যুবককে দেখতে পেলেন তিনি।

গায়ে নীল রঙের হাফশার্ট আর ধুতি। মাথার চুল খুব ঘন আর নিশ্চয়ই কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সর্ষের তেলের গন্ধ পাওয়া যাবে।

যুবকটি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পরমেশের পা চেপে ধরল।

পরমেশ বিব্রত হয়ে বললেন, আরে, আরে, একি!

স্যার, জ্যোৎস্না ভাল আছে তো?

পরমেশ আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জ্যোৎস্না? জ্যোৎস্না কে?

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় যুবকটি মুখ তুলে তার দৃষ্টি দিয়ে যেন বিদ্ধ করতে চাইল পরমেশকে।

পরমেশ এই ধরনের নাটকীয় ব্যবহার একেবারেই পছন্দ করেন না। একটু সরে গিয়ে তিনি একটা চেয়ারে বসে কড়া গলায় জিজ্ঞেস কবলেন, কী ব্যাপার? একটু তাড়াতাড়ি বল, আমি কাজে ব্যস্ত আছি।

ছেলেটি সেই রকম বসে থাকা অবস্থাতেই বলল, স্যার, আপনি—আপনি বলছেন—জ্যোৎস্না কে? আপনি জ্যোৎস্নার খবর জানেন না?

পরমেশ আদেশের সুরে বললেন, ঐ চেয়ারে উঠে বস! আমি জ্যোৎস্না নামে কারুকে চিনি কিনা সে ব্যাপার পরে হবে। আগে বল, তুমি কে?

আপনি আমাকেও চিনতে পারছেন না?

পরমেশ দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

এই ছোট্ট নাটিকাটি দেখার কৌতূহল লীনাও সংবরণ করতে পারেননি। তিনি একপাশে দাঁড়িয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে আর একবার যুবকটির দিকে তাকাচ্ছেন।

আমার নাম মহিম। আমি গড়বন্দীপুর থেকে আসছি!

পরমেশের মুখের চেহারা বদলে গেল। মানুষের নাম তার মনে থাকে না কিন্তু জায়গার নাম তিনি কখনও ভোলেন না।

তিনি এবারে লজ্জিতভাবে হেসে বললেন, ও, গড়বন্দীপুর। হ্যাঁ, সেখানে গিয়েছিলুম বটে, তুমি মহিম—কিছু মনে কর না, এত মানুষের

সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, সকলের মুখ তো আর মনে রাখা সম্ভব নয়— এখন মনে পড়েছে, তুমিই তো আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলে— আর জ্যোৎস্না সেই স্কুল টিচারটি না? কবিতা লেখার ...তিক আছে—কী হয়েছে তার?

আপনি তার খবর জানেন না?

কী করে জানব?

আপনার কথাতেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে।

আমার কথাতে? কী বাজে বকছো! তার মুখটাই আমার ভাল করে মনে নেই!

মহিম খানিকটা উষ্মার সঙ্গে বলল, আপনার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে আমি জানি! আপনি তাকে দু'খানা চিঠি লিখেছেন!

পরমেশ এবারে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। লীনার বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না। চিঠি লেখার ব্যাপারে পরমেশ খুবই অলস। লীনা মাঝে মাঝে তাড়া দিয়ে বলেন, ইস, ছেলে-মেয়েরা এত আশা করে তোমায় চিঠি লেখে। তুমি দু'চার লাইনও উত্তর দিতে পার না? উত্তর পেলে ওরা কত খুশি হয় বল তো!

পরমেশ বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের গ্রাম ঘুরে আসার পর ঐ মেয়েটি আমাকে মস্ত মস্ত চিঠি লিখেছিল, আমি একটা-দুটো উত্তরও দিয়েছিলুম বটে। সে-ও তো চার-পাঁচ মাস আগের কথা।

আপনি জ্যোৎস্নাকে কলকাতায় আসতে বলেননি? সে কোথায় আপনি জানেন না?

গ্রাম থেকে যুবতী মেয়েদের ফুসলে আনা আমার কাজ নয়। সে সময়ও আমার নেই। কলকাতাতে সুন্দরী মেয়েদের এখনো অভাব পড়েনি।

লীনা এবারে বাধা দিয়ে বললেন, এই, তুমি এত নিষ্ঠুরভাবে কথা বলছ কেন?

মহিমের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ভাই, কী হয়েছে মেয়েটির বল তো?

মহিম কিছু বলার আগেই পরমেশ বললেন, আমি তোমায় বুঝিয়ে

দিচ্ছি। ঐ গড়বন্দীপুরে একটি মেয়েকে দেখেছিলুম। সে একটু অন্যরকম, সাধারণ গ্রামের মেয়ে বলতে যা বোঝায় সেরকম নয়। মেয়েটি অল্প বয়েসে বিধবা, কিন্তু নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, শিল্পচর্চার দিকে ঝোঁক আছে। ওর ধারণা, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে থাকতে পারলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারত, নাম করতে পারত। মেয়েটাকে খানিকটা পাগলাটেও বলতে পার!

লীনা বললেন, শুনে তো বেশ তেজী মেয়েই মনে হচ্ছে। তবে পাগলাটে বলছ কেন?

গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসার জন্য ওর যা জেদ, তা প্রায় পাগলামির পর্যায়েই পড়ে। কলকাতায় আসা কি অত সহজ?

কিন্তু কলকাতায় না এলে ও সুযোগই বা পাবে কী করে? তোমাদের সব পত্র-পত্রিকায় কি গ্রামের ছেলে-মেয়েদের লেখা ছাপা হয়? যদি কেউ ভালভাবে গান শিখতে চায়, গ্রামে সে কী করে সুযোগ পাবে? তোমাদের সব কিছুই তো কলকাতায়!

লীনা সব সময় মেয়েদের পক্ষ সমর্থন করে কথা বলে। বিদেশের নারী-মুক্তি আন্দোলনের কথা সে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত পড়ে। একটি মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সে যুক্ত।

পরমেশ ভাবলেন, লীনাকে যদি বলা যায় যে ঐ মেয়েটি প্রায় তাকে প্রেম নিবেদন করেছিল, তা হলে লীনার প্রতিক্রিয়া কী রকম হতো? জ্যোৎস্না এই বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল, তাতে কি রাজি হতো লীনা?

পরমেশ বললেন, পুরুষ জাতির পক্ষ থেকে আমি মেয়েদের প্রতি অবিচারের জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ মেয়েটিকে সাহায্য করার কোন উপায় আমার ছিল না।

লীনা মহিমকে জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে? একা?

মহিম বলল, দু'দিন ধরে ওর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। একা কি না তা জানি না!

পরমেশ খুব সূক্ষ্ম বিদ্রূপের সুরে বললেন, যতদূর মনে পড়ে, তুমি জ্যোৎস্নাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে। বিধবা-বিবাহে তোমার আপত্তি নেই। তুমি আটকাতে পারলে না ওকে?

আপনি চলে আসার পর ও আর কোনদিন আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলেনি।

এ ব্যাপারে আমাকে জড়াচ্ছো কেন বলো তো?

ও আপনাকে দেবতার মতন ভক্তি করে।

আমি দেবতা নই, আর দূর থেকে কেউ আমাকে ভক্তি করলেও তাতে আমার কোন হাত নেই। তুমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েও পারোনি, সেটা তোমারই ব্যর্থতা।

লীনা উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, কিন্তু মেয়েটা একলা একলা গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলো···কলকাতা তো ভাল জায়গা নয়। আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না! মেয়েটির বাবা-মা কী রকম? তাঁরা কোন খোঁজ-খবর নিচ্ছেন না?

পরমেশ বললেন, মেয়েটি একে তো অল্প বয়েসে বিধবা, বাপের বাড়িতেও তার নিজের মা নেই, সৎমা। একেবারে আইডিয়াল সিচুয়েশন! আমার যতদূর মনে পড়েছে, ও বলেছিল, ওর পিসতুতে না জ্যাঠতুতো দাদারা ওকে একবার মারতেও গিয়েছিল। এই রকম মেয়েদের নিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক লিখেছেন, তার পরেও সমাজটা এতদিনে বিশেষ বদলায়নি। শরৎচন্দ্র হয়তো শেষ পর্যন্ত কোন উদার-হৃদয় জমিদারপুত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দিতেন। আজকাল মুশকিল হচ্ছে, সেরকম জমিদারের ছেলেরাও নেই!

মহিম বলল, আমাদের ইস্কুলে একজন বাংলার মাস্টার এসেছিল, সে-ও কবিতা লেখে।

গল্পের একটা নতুন বাঁকের সন্ধান পেয়ে পরমেশ উৎকর্ণ হয়ে বললেন, তাই নাকি? কী নাম তার?

সত্যেন আইচ। আমাদের মেদিনীপুরেরই ছেলে।

পরমেশ পত্র-পত্রিকা প্রায় সবই উল্টে-পাল্টে দেখেন। এই নামের কোন তরুণ কবির লেখা তাঁর চোখে পড়েনি। অর্থাৎ এ-ও আর

একজন শখের কবি। বাংলা পত্রিকা-জগতে এরকম কবির অভাই নেই।

তারপর কী হলো? জ্যোৎস্নার সঙ্গে তার ভাব হলো?

সে রকম কিছু নয়। তবে দু'জনে একসঙ্গে বসে অনেক কথা বলতো! সেই মাস্টারই নাকি বলেছিল, জ্যোৎস্নার। লেখা 'দেশ' কাগজে ছাপিয়ে দেবে!

মাস্টারের নিজের লেখা কি কোথাও ছাপা হয়েছে?

তা আমি জানি না স্যার। হয়েছে বোধহয়। লম্বা-চওড়া কথা বলতো খুব।

বলতো মানে? সে এখন আর তোমাদের গ্রামে নেই?

না। আমাদের সেক্রেটারির সঙ্গে কী ঝগড়া হয়েছিল, গত মাসে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যোৎস্নাকে পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো? সুতরাং দুটি ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকতে পারে। আমাদের এই কবি-মাস্টারটি কি বিবাহিত?

ঠিক জানি না, বোধহয় না।

বাঃ! চমৎকার!

লীনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করলেন।

পরমেশ বললেন, মহিম, তুমি সত্যিই বড় ভাল ছেলে। তোমার কাছ থেকে আমি খানিকটা রাগ, হিংসা, তেজ আশা করেছিলুম। তুমি জ্যোৎস্নার ওপর জোর জবরদস্তি করতে পারতে। কিন্তু তুমি তা করোনি। তুমি ওকে সত্যি ভালবাসতে। তোমার মনের অবস্থাটা আমি কিছুটা বুঝতে পারছি। তুমি চা খাও, অন্য কিছু খাবার খাও! মন-খারাপের সময় খালি পেটে থাকতে নেই। লীনা, ও অনেক দূর থেকে এসেছে, ওকে ভাল করে খেতে-টেতে দাও। আমি লিখতে চললুম!

পরমেশের ব্যবহারের নিষ্ঠুরতায় শুধু মহিম নয়, লীনাও আহত বোধ করলেন। কিন্তু পরমেশ আর সেখানে অপেক্ষা না করে চলে এলেন নিজের ঘরে।

এবং সত্যিই তিনি নিজের অসমাপ্ত লেখাটিতে মন দিলেন আবার।

দুপুরবেলা পরমেশের বিশ্রামের সময় লীনা বললেন, তুমি কী রকম

মানুষ গো ? গ্রাম থেকে ছেলেটি ছুটে এসেছে তোমার কাছে, তুমি ওকে একটা অন্তত ভাল কথা বলতে পারতে না ? ও যে-মেয়েটিকে ভালবাসে তার কোন সন্ধান নেই, তোমার ওপর ভরসা করে এতদূর ছুটে এসেছে।

পরমেশ একটা বই পড়ছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, উঁ ? কী বলছো ?

হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে লীনা বললেন, আমার সঙ্গে একটু কথা বলারও সময় নেই তোমার ? সব সময় হয় লেখা, না হয় বই পড়া ?

পরমেশ বললেন, জানতুম, এই গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীটি তোমায় খুব বিচলিত করবে ! নায়ক এক নীল শার্ট পরা সরল গ্রাম্য যুবক, নায়িকা এক যুবতী বিধবা, যে আবার কবিতা লেখে, গান গায়। আর ভিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। কোন লোক যেমন মেয়েদের সিনেমায় নামাবার লোভ দেখিয়ে ঘরের বার করে, এই লোকটি সে-রকম কবিতা ছাপাবার লোভ দেখিয়ে একটি মেয়ের মাথা ঘুরিয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই ধরনের কাহিনী আমার কলমে ঠিক আসে না।

তুমি এটাকে শুধু একটা লেখার বিষয়বস্তু বলে ভাবছ ? কিন্তু এটা একটা জীবন্ত সমস্যা, এরা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ। এই সমস্যাটা নিয়ে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তোমরা লেখকরা কি সত্যিকারের জীবন সম্পর্কে উদাসীন ?

শোনো লীনা, পৃথিবীতে অনেক সমস্যা আছে আমি জানি। চোখের সামনে কতই তো দেখতে পাচ্ছি রোজ। কিন্তু যে সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় আমার জানা নেই, সে সমস্যার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। ওদের ব্যাপারে আমি কী করতে পারি বল তো।

তুমি কিছু করতে পার কি না পার, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু তুমি আজ সকালে এই ঘটনা শুনেও হঠাৎ উঠে এসে লিখতে বসতে পারলে কী করে ? তোমার মনে কি একটুও দাগ কাটল না ওদের কথা ?

আমি যে লেখাটা লিখছিলাম, সেটা যদি খারাপ হয়, সবাই আমার নিন্দে করবে। এমন কি তুমিও বলবে, তোমার লেখা আজকাল ভাল

হচ্ছে না। কেউ কি জানতে চাইবে যে এই লেখাটা লেখার সময় আমি কয়েকটি গ্রামের ছেলেমেয়ের জীবন্ত সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলে লেখাটার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিনি? পত্রিকার সম্পাদক কি ঠিক সময় লেখাটা না পেলে আমার এই কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করবে? লেখকদের জীবনের এইটাই তো ট্রাজেডি।

পরমেশের বুকের ওপর মুখ এনে লীনা আবেগ জড়ানো গলায় বললেন, তবু সত্যি করে বল তো, এই যে জ্যোৎস্না নামের মেয়েটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল, যে তার জীবনে নিজের পরিবেশ ছাড়িয়ে আরও বড় হতে চেয়েছিল, সেই মেয়েটি, যদি কোনো ভুল করে, মানে, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে যায়, সে কথা শুনে তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয় না?

পরমেশ বললেন, এই প্রশ্নের উত্তর শুধু তোমাকেই বলতে পারি। পৃথিবীর আর কারুকে বলা যায় না। লেখকদের বোধহয় দুটো আলাদা হৃদয় থাকে। আমার একটি হৃদয়ে ঐ মেয়েটির জন্য সত্যিই কষ্ট হয়েছে, একটা কাঁটার মতন আত্মগ্লানি সেখানে বিঁধে আছে। আবার আর একটা হৃদয় বলছে, তুমি ঐ উটকো ঝামেলা নিয়ে মাথা ঘামিও না, পরমেশ। তুমি তো কিছুই করতে পারবে না। তুমি সমাজ-সংস্কারক নও, তাছাড়া আজকাল সমাজ-সংস্কারকদেরও কোনো দাম নেই, রাজনীতি দিয়েই সবকিছু চলে।

লীনা বললেন, সত্যি কি আমরা চেষ্টা করলেও কিছুই করতে পারি না? অন্তত একজন দু'জনকেও সাহায্য করতে পারি না!

আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সে রকম দু'একটি ছেলেকে হয়তো আমি কখনো সাহায্য করেছি। কিন্তু ঐ রকম কোনো মেয়েকে আমি সঙ্গে করে কোনো প্রকাশক বা সম্পাদকের কাছে নিয়ে গেলে সকলেই তার ভুল ব্যাখ্যা করবে। এমনিতেই আমার চরিত্রের খুব একটা খ্যাতি নেই।

হঠাৎ তুমি এমন সাধুপুরুষ হয়ে উঠলে যে? এত সাবধানী···

এনাফ্ ইজ এনাফ্! এবারে তুমি আমাকে একটু বইটা পড়তে দেবে?

শুধু আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও! তুমি ঐ মহিম ছেলেটার

সঙ্গে অত খারাপ ব্যবহার করলে কেন? ও তো কোনো দোষ করেনি। বেশ তো ভদ্র ছেলে, ও ঐ মেয়েটাকে ভালবাসত, ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

ঐ রকম ভাল ছেলে আমি অনেক দেখেছি। ওরা আসলে কাপুরুষ। বিধবা বিয়ে করার মতন উদারতা ওর আছে, কিন্তু জ্যোৎস্না তো এখন কুলটা হয়ে গেছে, এর পরেও ও জ্যোৎস্নাকে বিয়ে করতে পারবে? জ্যোৎস্না যদি একজন স্কুল মাস্টারের সঙ্গে পালিয়ে এসে থাকে, তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া গেলেও ঐ মহিম তাকে নেবে? কক্ষনো না! সুতরাং জ্যোৎস্নাকে ওর আর খোঁজাখুঁজি করার কী দরকার? জ্যোৎস্নাকে তার নিয়তি যেখানে নিয়ে গেছে, সেখানেই থাক! মহিম এবারে স্বজাতি দেখে, বেশ ভাল পণের টাকা নিয়ে একটি গ্রামের মেয়ে বিয়ে করুক! জ্যোৎস্নার মতন মেয়ে মহিমদেব জন্য নয়।

এর পরের কয়েকটা দিন পরমেশ বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটালেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, জ্যোৎস্না কলকাতায় এলে একবার না একবার তাঁর সঙ্গে ঠিক দেখা করবার চেষ্টা করবেই। জ্যোৎস্না তাঁর ঠিকানা জানে।

কিন্তু আটদিন-দশদিন কেটে গেল, জ্যোৎস্না দেখা করতে এলো না। জ্যোৎস্নার কোন খবরও পরমেশের কানে এলো না। পাতলা মেঘের মতন মাঝে মাঝে ঐ মেয়েটির চিন্তা পরমেশের মনে ছায়া ফেলে কেউ উপস্থিত যায়।

তারপর এক রবিবার সকালে একটি যুবক এলো তাঁর কাছে। রবিবার দিন এরকম অনেকেই আসে, লেখা-টেখা চাইতে কিংবা নিজেদের লেখা দেখাতে। এই যুবকটি যখন এলো, তখন আর অন্য ছিল না।

খুবই রোগা আর ঢ্যাঙা চেহারা, থুতনিতে রুখু দাড়ি, চোখ দুটি জ্বলজ্বলে, পা-জামা আর পাঞ্জাবী পরা, কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ। মাথার চুল এলোমেলো।

পুরো একখানা কবিতার খাতা সে তুলে দিল পরমেশের হাতে।

পরমেশ প্রথম পাতা উল্টেই দেখলেন, এই কবির নাম সত্যেন আইচ।

পাতা উল্টে উল্টে তিনি কয়েকটি কবিতায় চোখ বুলোলেন। একটা লেখাও ঠিক মতন দাঁড়ায়নি। ছন্দের জ্ঞান নড়বড়ে। মাঝে মাঝেই দু' একটা লাইন স্পষ্টতই অন্য কবির লেখা থেকে নেওয়া। এমনকি পরমেশ তাঁর নিজের কয়েকটা লাইনও চিনতে পারলেন।

কবিতাগুলি পড়ার পর খাতাটি পাশে রেখে দিয়ে কোন মন্তব্য না করে পরমেশ হাঁক ছাড়লেন, লীনা, লীনা, একবার শুনে যাও!

লীনা আসতেই পরমেশ বললেন, এই যে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এর নাম সত্যেন আইচ। সত্যেন একজন কবি।

লীনারও স্মৃতিশক্তি এত প্রখর নয়। এই নাম শুনে তাঁর মুখে কোন রেখা ফুটলো না। তিনি কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর দিকে।

পরমেশ বললেন, এই সত্যেন কিছুদিন গড়বন্দীপুরের প্রাইমারী স্কুলে বাংলা পড়িয়েছে। তাই না সত্যেন? এবারে বলো, জ্যোৎস্নার কী খবর? কেমন আছে সে?

সত্যেন একেবারে শারীরিক ভাবে কেঁপে উঠল পরমেশের কথা শুনে। তার মুখখানা বালি কাগজের মতন হয়ে গেল।

সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, আমি…মানে…আমি তো জ্যোৎস্নার খবর জানি না! আপনি কোন্ জ্যোৎস্নার কথা বলছেন?

পরমেশ চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে বললেন শোনো, আমি মরালিস্ট নই। তুমি অ্যাডাল্ট, জ্যোৎস্নাও অ্যাডাল্ট। তোমরা যা খুশি করতে পারো, তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা শুনেছিলুম যে জ্যোৎস্না তোমার সঙ্গে গড়বন্দীপুর ছেড়ে চলে এসেছে। মেয়েটিকে চিনতুম বলে তার খবর জিজ্ঞেস করছি!

সত্যেন তো আর মহিম নয়। সে ইস্কুলে পড়ায় এবং কবিতা লেখে। তার চরিত্রে ঝাঁঝ আছে। এতক্ষণে সে তার ব্যক্তিত্ব ফিরে পেয়ে জোরের সঙ্গে বলল, কে বলল, জ্যোৎস্না আমার সঙ্গে চলে এসেছে? মিথ্যে কথা! আমি নিজে ঐ গ্রামের চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। ঐ স্কুলের সেক্রেটারিটা এক মহা শয়তান। জ্যোৎস্না কর্মকারের সঙ্গে ওর একটা যা-তা সম্পর্ক আছে, আমি সব জানি!

পরমেশ বলল, জ্যোৎস্না তোমার সঙ্গে আসেনি? তাহলে আমরা ভুল শুনেছিলুম! ব্যস, ফুরিয়ে গেল! তুমি এত রাগ করছো কেন?

আপনি এমনভাবে বললেন, যেন আমি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছি। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আপনাকে আমার লেখা দেখাতে এসেছি, কিন্তু এরকম কথা শুনবো তা আশা করিনি।

এবার লীনা স্বামীর সমর্থনে মুখ খুলে বললেন, না, উনি তো বলেননি যে আপনি কোন মেয়েকে ভুলিয়ে এনেছেন! উনি বলেছিলেন, জ্যোৎস্না আপনার সঙ্গে এসেছে কি না! এলে, সে কেমন আছে?

না, সে আমার সঙ্গে আসেনি!

তা হলে তো আর কোন কথাই নেই। গড়বন্দীপুরে জ্যোৎস্নার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছিল নিশ্চয়ই। সে-ও কবিতা লেখে।

হ্যাঁ, জ্যোৎস্না কর্মকার তার কিছু কবিতা দেখিয়েছে আমাকে। খুবই কাঁচা লেখা, হাত তৈরি হয়নি। বিশেষ পড়াশুনো নেই। আমি একটু-আধটু কারেক্ট করে দিয়েছি।

পরমেশ অতি কষ্টে হাসি সামলালেন। সত্যেন আইচের নিজের কবিতাই এখনো ছাপার যোগ্য নয়, অথচ সে জ্যোৎস্না কর্মকারের কবিতা সম্পর্কে খুব বিজ্ঞের মতন মতামত দিচ্ছে।

জ্যোৎস্না গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তুমি জানো?

হ্যাঁ জানি!

লীনা চমকে তাকালেন স্বামীর দিকে। পরমেশ তখন সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই খুঁজতে ব্যস্ত। মুখ ফিরিয়ে পাকা গোয়েন্দার মতন ভঙ্গিতে বললেন, তুমি জানো? কী করে জানলে? তুমি তো গত মাসেই স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছো?

কয়েকদিন আগে সে আমার বাড়িতে এসেছিল।

তোমার বাড়িতে? কোথায় তোমার বাড়ি?

দেখুন, সোনারপুরে আমার মামার বাড়ি। গড়বন্দীপুরের চাকরি ছেড়ে আমি সেখানে এসে উঠেছি! সেখানে একটা স্কুলে আমার একটা চাকরির কথা হচ্ছে। এক সন্ধ্যেবেলা সেখানে জ্যোৎস্না হঠাৎ এসে হাজির। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। আমি নিজের মামাবাড়িতে কোনোরকমে

থাকার জায়গা পেয়েছি, সেখানে আমি একটা মেয়েকে রাখব কী করে ?

জ্যোৎস্না তোমার কাছে থাকবে বলে এসেছিল ?

বলল তো, কলকাতায় ওর কোন থাকার জায়গা নেই।

তোমার মামাবাড়ির ঠিকানা ও জানলো কী করে ?

তা আমি কী করে জানবো ?

নিশ্চয়ই জানো ! তুমিই তাকে বলেছিলে !

যদি বা বলেই থাকি ! আমি কি তাকে সেখানে আসতে বলেছি ? আমি চাকরি ছাড়ার সময় সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কোথায় যাব ? আমি তখন সোনারপুরের কথা বলেছিলুম। কিন্তু আমি কি সেখানে তাকে আসতে বলতে পারি ?

তবু সে এমনি এমনি চলে এলো ?

আপনি কি আবার আমাকে দায়ী করতে চাইবেন ?

পরমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

লীনা বললেন, তোমার বাড়িতে তাঁকে থাকার জায়গা দাওনি, তারপর সে কোথায় গেল ?

আমি তাকে গ্রামে ফিরে যেতে বললুম।

সেই রাত্তিরেই ?

আমি আর কি করতে পারি বলুন !

একটা মেয়েকে এক রাত্তিরের জন্যও বাড়িতে স্থান দেওয়া যায় না ! তোমরা আধুনিক লেখক, কত সব বিপ্লবী কথা লেখ···সেই রাত্তিরে মেয়েটি অত দূরের গ্রামে ফিরে যাবে কী করে ? রাস্তা চিনতে পারবে ?

রাস্তা চিনে যদি আসতে পারে, তাহলে ফিরে যেতে পারবে না ? আমি ওকে শিয়ালদার ট্রেনে তুলে দিয়েছি।

পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন, এটা কতদিন আগেকার কথা ?

সত্যেন হিসেব করে বলল, তা ধরুন, আঠারো-উনিশ দিন আগে তো হবেই। হ্যাঁ, এক্‌জ্যাক্টলি উনিশ দিন।

পরমেশ লীনার দিকে ফিরে বললেন, মহিম কতদিন আগে এসেছিল ? পনেরো-ষোল দিন হবে, তাই না ? অর্থাৎ জ্যোৎস্না গ্রামে ফেরেনি ! আর কোন দিন ফিরবে না। লীনা উৎকণ্ঠিত ভাবে

বললেন, কেন, আর ফিরবে না কেন?

আমাদের দেশের মেয়েরা একবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলে আর তাদের ফেরার পথ থাকে না।

সত্যেন বলল, ঐ মহিমটা একটা রাসকেল। সব সময় মেয়েটির পেছন ঘুর ঘুর করত!

পরমেশ তীব্র চোখে তাকালেন সত্যেনের দিকে। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না।

এখন তাঁর দুটি হৃদয় একাকার হয়ে গেছে। শুধু একটা কথাই তাঁর মনে পড়ছে। জ্যোৎস্না ওরকম বিপদে পড়েও তাঁর কাছে আসেনি।

নির্জন মাঠের মধ্যে একটাখালের ধারে, জ্যোৎস্না যার নাম দিয়েছিল খঞ্জনা নদী আর জ্যোৎস্না নিজের নাম দিয়েছিল অঞ্জনা, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে পরমেশের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে চেয়েছিল। পরমেশ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই অভিমানে জ্যোৎস্না কলকাতায় এসেও তাঁর বাড়িতে আসতে চায়নি।

পরমেশ কি ওকে প্রত্যাখ্যান করে কোনো অন্যায় করেছিলেন?

এত কাণ্ডের পরেও সত্যেন জিজ্ঞেস করল, আমার কবিতাগুলো আপনি পড়ে দেখবেন না?

পরমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, খাতাটা রেখে যাও, পরে দেখব।

সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হয়ে গেছে লীনার! সারাদিন ধরে বার বার ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করতে লাগলেন, মেয়েটা কোথায় গেল বল তো! কলকাতায় কারুকে চেনে না, গ্রামেও ফিরে গেল না…।

লীনা এমন কি এ কথাও বললেন, পরমেশের একবার গড়বন্দীপুরে গিয়ে খবর নিয়ে আসা উচিত। পরমেশের সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই। তিনি সব কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখলেন মহিমকে। তার উত্তর এলো না।

পরমেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা অফিসে খোঁজ নিলেন জ্যোৎস্না কর্মকার নামে কেউ কোনো লেখা পাঠিয়েছে কিনা। কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারল না। কয়েকটি সাহিত্যসভায় কিংবা কবিতাপাঠের

আসরে তিনি দর্শকদের মধ্যে প্রতিটি মুখ খুঁজে দেখলেন। জ্যোৎস্না কোথাও নেই। সে হারিয়ে গেছে।

পরমেশের মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই জ্যোৎস্নামাখা আকাশের নিচে দাঁড়ানো সেই জ্যোৎস্না নামের মেয়েটির কথা। তার কান্না। তার হঠাৎ ছুটে চলে যাওয়া।

মেয়েটা বোকা ছিল, মেয়েটা পাগলাটে ছিল। তা হলেও এরকম একটা নিয়তি তার প্রাপ্য ছিল না। সে একা একা কলকাতা শহরে হারিয়ে গেল। একটি সহায়-সম্বলহীন মেয়েকে কি এই শহর সুস্থির ভাবে বাঁচতে দেয়?

রবীন্দ্রনাথ 'সাধারণ মেয়ে' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন। সেই কবিতায় সাধারণ মেয়েটি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল জিতিয়ে দিতে। জ্যোৎস্নাকেও কি সেইভাবে জিতিয়ে দেওয়া যায় না? এক ছদ্মবেশী রাজকুমার কলকাতার রাস্তায় আবিষ্কার করল জ্যোৎস্নাকে। চুম্বক আর লোহার মত পরস্পর আকৃষ্ট হল তারা। তারপর জ্যোৎস্নাকে সে নিয়ে গেল এক সুদূর পাহাড়-চূড়ার রাজপ্রাসাদে। সেখানে জ্যোৎস্না এখন সেই রাজকুমারকে তার কবিতা পড়ে শোনায়, আকাশের দিকে চেয়ে গান গায়।

পরমেশ একবার মনে মনে বলেন, যেন তাই হয়, যেন তাই হয়।

পরের মুহূর্তেই ভাবেন, ধুৎ! এ তো শুধু হিন্দী সিনেমাতেই সম্ভব।

জ্যোৎস্নার যাই হোক না কেন, তার জন্য পরমেশকে সারাজীবন একটা গোপন দুঃখ বহন করে যেতে হবে।